বঙ্গ
কমলবার্তা
অক্টোবর সংখ্যা। ২০২৪

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার,
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার।।

হরিয়ানায় হ্যাটট্রিক বিজেপির

বঙ্গে কালী আরাধনা

বাংলা ভাষার 'ধ্রুপদী' মর্যাদা প্রাপ্তি

এক দেশ এক নির্বাচন

ইজরায়েলি সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্যালেস্টাইন ইস্যুর প্রাসঙ্গিকতা ভারতীয় প্রেক্ষাপট

দুয়ারে ধর্ষণ-খুন, বাড়ছে প্রতিরোধের আঁচ
পথ দেখাচ্ছে **সন্দেশখালি?**

তৃণমূলের নির্লজ্জ তোষণের শিকার এবার **মা দুর্গাও**

১৯৪৬-এর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা
বাঙ্গালীর এক **আতঙ্কের দিন**

জনকল্যাণ ও সুশাসন নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

হরিয়ানায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও হরিয়ানার দ্বিতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দৌত্য মজবুত করতে এবং চিনের বিরুদ্ধে পাল্টা ভূরাজনৈতিক চাপ বহাল রাখতে দুদিনের লাওস সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পূর্ব এশিয়া শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রথম বৈঠক প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর।

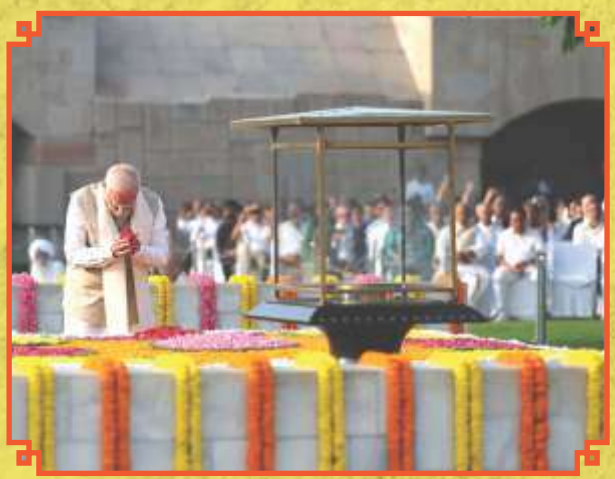

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে রাজঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে শিশুদের সাথে স্বচ্ছতা অভিযানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
অক্টোবর সংখ্যা। ২০২৪

দুয়ারে ধর্ষণ-খুন, বাড়ছে প্রতিরোধের আঁচ
পথ দেখাচ্ছে সন্দেশখালি? ৪
জয়ন্ত গুহ
পশ্চিমবঙ্গ নাকি পশ্চিম বাংলাদেশ!
তৃণমূলের নির্লজ্জ তোষণের শিকার এবার মা দুর্গাও ৭
অভিরূপ ঘোষ
হরিয়ানায় হ্যাটট্রিক বিজেপির
পানিপথের রাজ্যে নির্ণায়ক জয় পেল ভারতীয় শক্তি ১০
সৌভিক দত্ত
বাংলা ভাষার 'ধ্রুপদী' মর্যাদা প্রাপ্তি
ভারতীয়ত্বের পুনর্জাগরণ ১২
কৌশিক কর্মকার
ছবিতে খবর ১৬
বঙ্গে কালী আরাধনা
স্বাজাত্যাভিমান ও স্বাধীনতা অন্বেষণের প্রতীক ২২
বিনয়ভূষণ দাশ
১৯৪৬-এর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাঃ বাঙ্গালীর
এক আতঙ্কের দিন ২৫
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
এক দেশ এক নির্বাচন ২৮
নারায়ণ চক্রবর্তী
ইজরায়েলি সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্যালেস্টাইন
ইস্যুর প্রাসঙ্গিকতাঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ৩০
আবীর রায়গাঙ্গুলী
ফেক নিউজ ৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

কেউ ভাল নেই কেউ ভাল নেই
শহর জুড়ে, দুঃসময়ে ডাইনি আঁধার
সুখ কেড়েছে আরজি করে তিলোত্তমার-
কৃষ্ণনগর – জয়নগরে বিজয়া আর অপরাজিতার।

অদ্ভুত এক সময় আর অদ্ভুত এক রাজ্য! এখানে নাবালিকা থেকে নারী- বেঘোরে প্রাণ যায় মেয়েদের, সম্মানহানি হয় দিনেদুপুরে, খুন হয় সরকারি হাসপাতালে- পাড়ায় পাড়ায়-মাঠেঘাটে, খুন-ধর্ষণ হলে টাকার অফার, না নিতে চাইলে প্রমাণ লোপাট বা হুমকি দিয়ে ভয় দেখানো, তাতেও কাজ না হলে কেস দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া। তবে হাতেনাতে ফেঁসে গেলে 'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই' বলে লোকদেখানো বাতেলা আর একই সঙ্গে দোষীকে আড়াল করার প্রাণপণ চেষ্টা। এত কিছুর পরও কি দাবী করা যায় – 'এগিয়ে বাংলা'? ছন্দের তালে তালে নাচা যায় ডান্ডিয়া? গলা চড়িয়ে হুমকির সুরে কথা বলা যায় সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে? হতে পারে একটি মানুষ আর মানুষ নেই। মেটামরফোসিস হয়েছে বা বাংলার পরিবর্তন না করতে পেরে নিজেরই তাঁর এমন পরিবর্তন হয়েছে যে কথা বললেই এখন হুমকি ছাড়া কিছু আসে না। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছেন হুমকি বা ফাঁকা আওয়াজ দেওয়া ছাড়া তাঁর বাংলাকে কিছু দেওয়ার নেই। তিনি জানেন তিনি ভিখারি। রাজ্যের মহিলাদের প্রাপ্য নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অর্থনীতিতে রাজ্যের মুখে হাসি ফোটানোর ক্ষমতা নেই। বর্ধিত ডিএ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সন্দেশখালি সহ রাজ্যের গ্রামগুলিতে শাহজাহান বাহিনীর হাত থেকে মানুষকে সমৃদ্ধি দেওয়ার ক্ষমতা নেই – শুধু আছে তাঁর ভয়। সাংঘাতিক ভয়। প্রতিবাদে ভয়। চোখে চোখ রেখে কথা বললে ভয়। ভুল ধরিয়ে দিলে ভয় এবং ভয় দেখানোর ছলাকলায় ভয় না পেলে ভয়। যেমনটা হাতেনাতে বাংলায় প্রথম করে দেখিয়েছিল সন্দেশখালির রেখা পাত্র এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা। উনি সেদিন ভেবেছিলেন, ভাগাড় থেকে উচ্ছিষ্ট চেটে খাওয়া সাংবাদিকতার কলঙ্ক এক উচিংড়ে-কে দিয়ে রেখা পাত্রদের আন্দোলনকে ছোট করবেন। উলটে সেই সন্দেশখালির প্রতিবাদ ছড়িয়ে গেল শহরে। শহরের নাগরিক সমাজের মধ্যে, যে অদৃশ্য নাগরিক সমাজের প্রবল প্রতিবাদ জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের আসল শিরদাঁড়া ছিল।

এত কিছুর পর আমরা সবাই পূজা করব মা কালীর। কিন্তু ভবতারিণী মা কার পূজা নেবেন? জয়নগর- কৃষ্ণনগর – আরজি কর সহ রাজ্যে কন্যাসন্তান হারানো মায়েদের? স্বজন হারানো ভাই বোনদের? নাকি যাদের জন্য মায়ের বুক খালি করে চলে গেল বিজয়া- অমৃতা – তিলোত্তমারা? যার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ঢেউ? যার জন্য বাংলা ছেড়ে ভিন রাজ্যে যেতে হয় কাজের খোঁজে? যার জন্য অসভ্যেরা বলতে পারে "শিরদাঁড়া বেকিয়ে দেব"!

দুয়ারে ধর্ষণ-খুন, বাড়ছে প্রতিরোধের আঁচ

পথ দেখাচ্ছে সন্দেশখালি?

জয়ন্ত গুহ

শাসকের চোখে চোখ রেখে সাধারণ মানুষ যে স্পর্ধা দেখাতে পারে তা শহর নয়, শহরকে শিখিয়েছে রেখা পাত্ররা। নিঃসন্দেহে সেই মাটি কামড়ানো প্রতিরোধের ফুলকি শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অভয়ার নৃশংস খুনের পর। সন্দেশখালির দেখানো পথেই হেঁটেছে নাগরিক সমাজ আর সেই নাগরিক সমাজই ছিল ডাক্তারদের আন্দোলনের শিরদাঁড়া।

আরজি কর নিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলনকে আগাগোড়া সমর্থন দিয়ে, পাশে থেকে বিজেপির কি কোনও লাভ হল? শহরের একটি আন্দোলনের পাশে থেকে মফস্বল শহর বা গ্রামের রাজনীতিতে কোন লাভ হল বিজেপির। উত্তরে বলা যায়, বাম-তৃণমূল ফিশফ্রাই জোটের কি লাভালাভ হল সে তাঁদের ভাবনার বিষয় কিন্তু প্রথম দিন থেকে মানে ৯ অগাস্ট থেকে আদৌ কি বিজেপি লাভের অঙ্ক কষে ছিল? সবকিছুতে লাভের অঙ্ক কষে এগোনো বাংলার রাজনৈতিক দলগুলির একটি অসুখ হলেও এক্ষেত্রে বিজেপি প্রথম থেকে বুঝিয়ে দিয়েছে সত্যিই তাঁরা 'পার্টি উইদ আ ডিফারেন্স' বা অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। তবে হ্যাঁ, আমি-আপনি এবং অনেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে সন্দেশখালিতে শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে জোট তৈরি হয়েছিল, যে প্রবল প্রতিরোধে কেঁপে উঠেছিল শাসকের গদি – সেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ভোলেনি শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ। শাসকের চোখে চোখ রেখে সাধারণ মানুষ যে স্পর্ধা দেখাতে পারে তা শহর নয়, শহরকে শিখিয়েছে রেখা পাত্ররা। নিঃসন্দেহে সেই মাটি কামড়ানো প্রতিরোধের ফুলকি শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অভয়ার নৃশংস খুনের পর। সন্দেশখালির দেখানো পথেই হেঁটেছে নাগরিক সমাজ আর সেই নাগরিক সমাজই ছিল ডাক্তারদের আন্দোলনের শিরদাঁড়া। যে আন্দোলন ল্যাজেগোবরে করে ছেড়েছে সাধারণ নাগরিক এবং মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ অপদার্থ প্রশাসন ও সরকার। সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান এবং আরজি কর-এ সন্দীপ ঘোষ – কেয়ার অব তৃণমূল কংগ্রেস। দুই জায়গাতেই কিন্তু সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদ জামাকাপড় খুলে দিয়েছে 'এগিয়ে বাংলা'-র নামে 'দুয়ারে ধর্ষক'-দের।

সত্যিই যদি হিসাব কষতো বিজেপি তাহলে কোন লাভের আশায় বিজেপি নেতা অমিত মালব্য ৯ অগাস্ট বেলা ১২টা ৪৩ মিনিটে অভয়ার সেই মর্মান্তিক খবর প্রথম সমাজমাধ্যমে পোষ্ট করেছিলেন? ওই পোস্টেই তো সবাই নড়েচড়ে বসে। তার আগে অভয়ার খুনের খবর মিডিয়াতেও আসেনি। ওই পোস্টে অমিত মালব্য সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, খুনকে আত্মহত্যা বলে সাজাতে চাইছে কলকাতা পুলিশ। ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছেনা মিডিয়াকে।

রাজনীতি নয়, অমিত মালব্য চিৎকার করে নাগরিক সমাজকে এই অন্যায়ের কথা জানাতে চেয়েছিলেন। যা করেছিলেন তা লাভ নয়, মানবিক কারণে এবং বিবেক বোধের জায়গা থেকে করেছিলেন।

টিআরপি তোলার জন্য বামেরা যখন অভয়ার মরদেহের গাড়ি আটকে সস্তা নাটক করছে এবং সমাজমাধ্যমে তা পোষ্ট করে প্রচার করছে একটি মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক লাভ তোলার জন্য তখন নিঃশব্দে হাসপাতাল থেকে থানা, অভয়ার মা-বাবার পাশে পাশে ছিল বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, কৌস্তভ বাগচীরা। তিলোত্তমার মা-বাবার সঙ্গে সেদিন তাঁদের কি কথা হয়েছিল কেউ জানতে পারতো না যদি না কিছুদিন আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে বসে অভয়ার মা আক্ষেপ করে বলতেন – সেদিন ওদের (অগ্নিমিত্রাদের) কথা শুনলে ভাল হতো। মানে অভয়ার মরদেহ সংরক্ষিত হত এবং দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হত, তাড়াহুড়ো করে দাহ করে সব প্রমাণ লোপাট করে দিতে পারত না পুলিশ-তৃণমূল-প্রশাসন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে বিজেপির যে মানবিক রাজনীতি তাতে ঢাক বাজিয়ে প্রচারের প্রয়োজন হয়না। এমনিতেই সেই সত্য সামনে আসবে। আসবেই। আর রাজনীতিতে সবসময় সামনে দাঁড়িয়ে ক্রেডিট নিতে হবে এমনটা নয়। অনেকসময় মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদের জোয়ারকে নদী থেকে সাগরে পৌঁছে দিতে নিঃশব্দে রাস্তা তৈরিতে সাহায্য করতে হয়। সেটাও রাজনীতি। রাজার মত মহান যে নীতি। বিজেপি এই নীতিতে বিশ্বাস করে। বিজেপি জানে ব্যাটন হাতে না রেখে হাতে হাতে ছড়িয়ে দিতে হয়, সঙ্গে প্রতিবাদের ফুলকি আর অত্যাচারীর চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস।

জয়গাঁও-তে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে বিজেপি প্রতিনিধি দল ।

সত্যি কথা বুক বাজিয়ে বলার সাহস। রুখে দাঁড়ানোর সাহস। যেমনটা অভয়ার মৃত্যুর পর কলকাতার পাশপাশি রুখে দাঁড়িয়েছিল গোটা বাংলা। যেমনটা জয়নগরে নাবালিকা খুনের পর মানুষের প্রতিবাদ লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে। যেমনটা জ্বলে উঠেছিল সন্দেশখালিতে প্রথম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। সন্দেশখালিতেও কিন্তু দিনের পর দিন মহিলাদের ওপর অত্যাচার করেছিল তৃণমূলের শাহজাহান বাহিনী। মানুষ মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। মহিলারাই সেখানে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল। তারপর গোটা গ্রাম মহিলাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি। আর গ্রামের মানুষ, যখন একবুক আগুন নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন সবসময় তাঁদের প্রতিই সমর্থন থাকবে নাগরিক সমাজের। এর কোন অন্যথা হবেনা।

জয়নগরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে অগ্নিমিত্রা পাল।

২০১১ থেকে সন্দেশখালি আন্দোলনের আগে অবধি বহু মহিলা, নাবালিকা খুন হয়েছে। ধর্ষিত হয়েছে মর্মান্তিকভাবে কিন্তু অজানা এক ভয়ে সবাই চুপ থেকেছে। পথে নামেনি নাগরিক সমাজ। কিন্তু সন্দেশখালি আন্দোলনের পর বদলে গেছে সব। মানুষ আর ভয় পাচ্ছেনা। উলটে যারা ভয় দেখাত, হুমকি দিত তাঁরাই এখন প্রতিরোধের আঁচ পেলেই পালাচ্ছে বিদেশে। কেউবা ঘরে বসে মিডিয়ায় শিরদাঁড়া বেকিয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে, পথে নামার সাহস নেই।

গ্রাম থেকে আসা আগুনের ফুলকি দাবানল হয়ে আবারও ছড়িয়ে পড়ছে জয়নগর সহ কৃষ্ণনগর-আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁও সহ রাজ্যের মফস্বল শহর থেকে গ্রামে গ্রামে। নির্যাতিতার বাড়িতে যেতে গেলেই অসহায় পুলিশ বিজেপি নেতাদের আটকাতে চাইছে। কিন্তু তাতে কি আর প্রতিরোধের ঢেউকে আটকানো যায়? দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, বিরক্তি, রাগ, অভিমান, হতাশা কি এত সহজে পুলিশ বা ভয় দেখিয়ে আটকানো যায়? যায় না। ভেঙ্গে গেছে ধৈর্যের বাঁধ। প্রতিবাদ এখন সুনামি হয়ে আছড়ে পড়ছে। শাসক যত ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে ততই যেন রাজ্যের প্রতিটি জনপদে জ্বলে উঠছে সন্দেশখালির লেলিহান শিখা। প্রতিটি জনপদ হয়ে উঠছে এক একটি সন্দেশখালি।

মেদিনীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী

শুভজিৎ রায়কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী

বিমল দাসকে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

নৈহাটি বিধানসভা উপনির্বাচনে
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী

রূপক মিত্রকে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী

দীপক কুমার রায়কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী

রাহুল লোহারকে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

তালডাংরা বিধানসভা উপনির্বাচনে
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী

অনন্যা রায় চক্রবর্তীকে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

বিজেপি

/BJP4Bengal bjpbengal.org

পশ্চিমবঙ্গ নাকি পশ্চিম বাংলাদেশ!

তৃণমূলের নির্লজ্জ তোষণের শিকার এবার মা দুর্গাও

অভিরূপ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে দুই জায়গাতেই জেহাদি আগ্রাসনের শিকার মা দুর্গা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আগ্রাসনের অধিকাংশই খবরে আসেনা। বাংলাদেশের মত কলকাতাতেও অধিকাংশ সময় খবর হয়না। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় সেগুলিকে খবরে আসতে দেওয়া হয় না। পুলিশ প্রশাসন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে জেহাদি হামলার প্রতিটি ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার। বাংলাদেশেও হয়। পশ্চিমবঙ্গেও হয়। কলকাতাতেও হয়। বদলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ? এমনটা হওয়ার কি কথা ছিল?

ঘটনা এক:-

অক্টোবরের ১১ তারিখ। সময় দুপুর একটা তেরো। অষ্টমী পুজো শেষ হয়ে তখন নবমী পুজো চলছে নিউ বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব দুর্গামন্ডপে। হঠাৎ বিশেষ ধর্মাবলম্বী একদল উন্মত্ত জনতা ঢুকে এলো পূজা মন্ডপে। হুমকির ছলে জানালো এক্ষুনি বন্ধ করতে হবে দুর্গাপুজোর আচার অনুষ্ঠান। না হলে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হবে মা দুর্গার মূর্তি সমেত গোটা পূজামন্ডপ। চললো হিন্দুদের দেবতাদের উদ্দেশ্য করে অসভ্য ভাষায় গালাগালি, হাত তোলা হলো পূজা কমিটির সদস্যদের গায়ে। বন্ধ করে দেওয়া হলো দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান। আর এসবটাই ঘটছে অন্য কোথাও নয়, মন্ডপের ভেতরে।

ঘটনা দুই:-

দুর্গাপুজো উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল মণ্ডপে। বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন মনীষীদের ছবি আঁকা। সেখানে কোনো এক সনাতনী ভাই বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষদের আরাধ্যের ছবি এঁকেছিলেন। বলে রাখা ভালো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের আরাধ্যের ছবি শুধু কাল্পনিকই হতে পারে, কারণ বাস্তবে তার কোন ছবি নেই বলেই সংখ্যালঘু মানুষেরা বিশ্বাস করে। যাই হোক সম্মান জানাতে আঁকা এই কাল্পনিক ছবি পছন্দ হয়নি জিহাদিদের। তারা ঢুকে পূজা মন্ডপে ভাঙচুর করে। দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যদের মারধর করে এবং দুর্গা প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় ও একইসাথে অনেক জিনিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই সব কিছু চলে একটা দীর্ঘ সময় ধরে। অভিযোগ পুলিশকে জানানো হলেও তারা কোনরকম পদক্ষেপ নেয়নি।

ঘটনা তিন:-

অক্টোবরের ১৪ তারিখ। লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন। সময় মাঝ রাত। শিল্পী শিবু পাল বেশ কিছু লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরি করেছিলেন

বিক্রির জন্য। কে বা কারা মাঝরাতে এসে সেই সমস্ত প্রতিমা ভাঙচুর করে চলে যায়।

ঘটনা চার:-

অক্টোবরের ১৬ তারিখ। লক্ষ্মীপুজোর দিন। সরাসরি মন্ডপে ঢুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল লক্ষ্মী প্রতিমা। ঘটনাচক্রে ওই একই জায়গায় মা দুর্গার পবিত্র মূর্তিও ভেঙেছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

ঘটনা পাঁচ:-

অক্টোবরের দু তারিখ। অভিযান সংঘের সদস্যরা জানিয়ে দিল ১১২ ফুটের দুর্গাপ্রতিমা করে গোটা বিশ্বকে তাক

মহা অষ্টমীতে গার্ডেনরিচের নিউ বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব দুর্গামন্ডপ

লাগানোর পরিকল্পনা থেকে তারা সরে আসছে। না, তাদের তরফ থেকে কোন খামতি ছিল না। তারা তৈরিই ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট বা স্থানীয় প্রশাসন কেউই পূজার অনুমতি দেয়নি। এই নিয়ে তার আদালতেও গিয়েছিল। বিষয়টি নিম্ন আদালত হয়ে উচ্চ আদালতে গড়ায়। কিন্তু দিনের পর দিন উচ্চ আদালতের খরচ চালানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। তাই বাধ্য হয়ে তাদেরকে পুজো বাতিল করতে হলো। অভিমানে বিজয়া দশমীর দিন গ্রামের অনেকে মাথা ন্যাড়া করে প্রতিবাদও জানায়।

ঘটনা ছয়:-

আবারও অক্টোবরের ১৪ তারিখ। দুর্গাপ্রতিমাকে যথাযথ ভাবে বিসর্জন না দিয়ে ইলেকট্রিক করাতের সাহায্যে কেটে নির্দয়ভাবে টুকরো টুকরো করে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। একটা নয়, অনেক। আর সবটাই হল প্রশাসনের নির্দেশে।

ঘটনা সাত:-

মা দুর্গাকে বোধনের সময় চলছে। মন্দিরে যথারীতি বাজছে ঢাক। মা বোনেরা দিচ্ছেন উলু, বাজাচ্ছেন শঙ্খ। হঠাৎ মন্দিরে ঢুকে এলো একদল উগ্র জিহাদী। চললো হুমকি। মা বোনেদের গায়ে পড়লো হাত। আক্রমণ করার চেষ্টা করা হলো দুর্গা প্রতিমাকেও।

আমরা সবাই প্রতিবেশী বাংলাদেশে একের পর এক মূর্তি ভাঙার ঘটনা সম্পর্কে অবগত। মন্দির ভাঙচুর আগুন লাগানো তথা হিন্দু হওয়ার অপরাধে দিনের আলোয় খুন ধর্ষণ যে সেখানে স্বাভাবিক ঘটনা সেটাও আপনার অজানা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আপনার মনে হয়ে থাকতে পারে উপরের ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে। যদি তা ভেবে থাকেন তবে আপনি ভুল ভাবছেন। আসুন একের পর এক দেখে নেওয়া যাক উপরিউক্ত ঘটনার স্থান।

প্রথম ঘটনার স্থান কলকাতা পৌরসভার 'বিখ্যাত' সেই গার্ডেনরিচ - ফেসবুকে নিজেদেরকে বাঘ প্রমাণিত করা কলকাতা পুলিশের আওতাভুক্ত এলাকা। দ্বিতীয় ঘটনা স্থান পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শ্যামপুর - মেরে কেটে যা ৬০ কিলোমিটার দূরে রাজধানী কলকাতা থেকে। তৃতীয় ঘটনার স্থান চন্দননগরের ডুপ্লেক্স পট্টি কুমোরপাড়া। সেটাও কলকাতার খুব কাছে। চতুর্থ ঘটনার স্থান বজবজ যা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা উত্তরাধিকারী তথা মমতা ব্যানার্জির ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। পঞ্চম ঘটনার স্থান নদিয়া জেলার রানাঘাটের কমলপুর গ্রাম। ছ'নম্বর ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত কৃষ্ণনগর পৌরসভা। আর যদি পাঠক ভেবে থাকেন এ সবই ঘটছে শুধু দক্ষিণবঙ্গে তবে আবারও ভুল ভাবছেন। কারণ সপ্তম ঘটনা উত্তরবঙ্গের ফালাকাটার।

উপরের সাতটি ঘটনা কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আর ২০২৪ সালের দুর্গাপূজায় এই সাতটি ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র জিহাদি হামলার শিকার হয়েছে সনাতনীরা সেটাও নয়। পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে উত্তরের কোচবিহার জলপাইগুড়ি পর্যন্ত সর্বত্রই জেহাদি আগ্রাসনের শিকার মা দুর্গা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আগ্রাসনের অধিকাংশ খবরেই আসে না। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় সেগুলিকে খবরে আসতে দেওয়া হয় না। পুলিশ প্রশাসন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে জেহাদি হামলার প্রতিটা ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার। তারই মধ্যে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটা ঘটনা সামনে চলে আসে সেগুলোই শুধু জানতে পারে আপামর বাঙালি তথা গোটা দেশ। বাকিগুলো থেকে যায় স্থানীয় বাঙালির দুঃস্বপ্নের স্মৃতিতে।

এখন প্রশ্ন দুটো। এক, পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনাগুলোয় কি অ্যাকশন নিয়েছে। দুই, রাজ্য সরকার কেন সনাতনীদের উপর হামলা হলে সেটাকে স্বীকার পর্যন্ত করতে চায় না।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। পুলিশ প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয়নি এই ঘটনাগুলোয়। মিডিয়া এসব ঘটনা দেখাতে অনীহা প্রকাশ করলেও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক প্রথম সারির

কার্যকর্তাও পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন পুলিশের কাছে। কিন্তু বাস্তব সত্যি হলো নিচু তলার অধিকাংশ পুলিশ অসহায় এবং ভীতসন্ত্রস্ত। নিচু তলার পুলিশ কর্মীরা জানে জিহাদীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিলেও মমতা ব্যানার্জির বিশেষ স্নেহধন্য উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের নির্দেশে তাদেরকে পিছিয়ে আসতেই হবে। মমতা ব্যানার্জির অঘোষিত নির্দেশ আছে এইসব জিহাদিদের গায়ে হাত না দেওয়ার। হাজারো অপরাধের পরেও যদি এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার ন্যূনতম চেষ্টা করেন নিচু তলার কোন পুলিশ বা সরকারি কর্মী, তবে উপরতলার নির্দেশে তাঁরাই কর্মক্ষেত্রে বিপদে পড়বেন। সাথে যোগ হবে জিহাদিদের প্রতিশোধস্পৃহা। কালিয়াচক থেকে রাজাবাজার - প্রমাণ কিভাবে শেয়ালের মতো দল বেঁধে প্রশাসনের ওপর হামলা করে তারা। আর হামলায় আক্রান্ত হয় নিচু তলার পুলিশ কর্মীরাই। আবারও যথারীতি মামলাকারীদের উপর কোন রকম আইনি শাস্তি চাপানো হয় না। ফলে তাদের সাহস উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। যেমনটা হয় বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে।

আর ঠিক বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মতোই জিহাদিদের তোল্লাই করে চলা হয় এ রাজ্যেও, কারণ মমতা ব্যানার্জির নিজের মুখের কথায় তারা 'দুধেল গাই'। মমতা ব্যানার্জি পরিষ্কার করে দিয়েছেন জিহাদি ভোটের সবটাই তাঁর চাই। সাথে সাথে তিনি এটাও সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন যাতে জিহাদিরা সনাতনী হিন্দুদের ভোটটুকুও লুট করতে পারে। আর যেহেতু জিহাদিরা রেজিমেন্টেড অর্থাৎ সংঘবদ্ধ, তাই হিন্দুদের ওপর হাজারো হামলা হলেও মমতা ব্যানার্জি সেগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে দেয় যাতে তার জিহাদি ভাইয়েরা একটুও রাগ বা অভিমান না করে। আর এসব করতে করতেই অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে গোটা রাজ্য। খেয়াল করলে দেখা যাবে ব্যানার্জি পরিবারের পরে তৃণমূলে যাঁর স্থান সব থেকে উপরে সেই মন্ত্রী বারবার সনাতনীদের নিয়ে খারাপ কথা বললেও তাঁর প্রতি মমতা ব্যানার্জির স্নেহে একটুও কমতি হয়নি। উল্টে তিনি আরো ক্ষমতাধর হয়েছেন দিনের পর দিন। একই রকম ভাবে রাজ্যের বিধায়ক সনাতনীদের কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বললেও তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর টুকু করা হয় না। দলগত পদক্ষেপ সেখানে অনেক দূরের কথা। বাংলাদেশে যেমন প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল করে হিন্দু বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়, তেমন মালদা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় আজকাল সনাতন বিরোধী মিছিল প্রকাশ্য রাস্তায় নামতে শুরু করেছে। শুধু

হলনা রানাঘাটে ১১২ ফুট উচ্চতার দুর্গা পূজা

এবং শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের কথা ভেবে তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম পদক্ষেপ নেয় না মমতা ব্যানার্জি। রামনবমীর মিছিল বা দুর্গাপুজোর মন্দিরে হামলা তাই হওয়ারই ছিল। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাবনা, হাওড়া শিবপুরে রাম নবমীর শোভাযাত্রার উপর হামলা করেছিল যে জিহাদি তার বাড়িতেই চাল-তেল-সবজি পৌঁছে দিয়ে এসেছিল প্রশাসন। যেহেতু জিহাদি ভোটব্যাংক মমতা ব্যানার্জির কাছে এতটাই প্রিয় তাই সনাতনীদের উপর সব রকম হামলা তিনি শুধু সহ্য করেন তাই নয় সেগুলিকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টাও করেন।

এরপর আপাতত শেষ প্রশ্ন। কোন দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা! কি ভবিষ্যৎ আমাদের সোনার বাংলার! এটার উত্তর সম্ভবত সব থেকে সহজ। মমতা ব্যানার্জির শাসনে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে পশ্চিম বাংলাদেশ হবার দিকে। 'এগিয়ে চলেছে' শব্দবন্ধ ব্যবহার করাও হয়তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উচিত হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হয়েই গেছে মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে। একসময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি লড়াই করে এই রাজ্য তৈরি করেছিলেন হিন্দু বাঙালির হোমল্যান্ড হিসাবে। তিনি জানতেন বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সনাতনীরা কোনভাবেই সুরক্ষিত নয়। তাই নিজস্ব ভাষা এবং ধর্ম টিকিয়ে রাখার জন্য মরণপণ লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে এনেছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও কল্পনা করতে পারেননি যে প্রথমে সিপিএম এবং পরে মমতা ব্যানার্জি এসে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম-বাংলাদেশ করে দেবে নিজেদের ক্ষমতা ও ভোট ব্যাংকের লালসায়। সম্ভবত সেদিন স্বপ্নেও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভাবতে পারেননি এই পশ্চিমবঙ্গের বুকেই হামলার শিকার হবেন খোদ মা দুর্গাও।

২০২৪ সাল এক প্রবল অশনি সংকেত দেখিয়ে গেল বাঙালিকে। এখন দেখার যে নিজেদের জাতিসত্ত্বা ও ধর্মরক্ষার তাগিদে সনাতনী বাঙালিরা প্রতিরোধে রাস্তায় হাঁটবে নাকি স্বাধীনতার পর দ্বিতীয়বার রিফিউজি হয়ে পা বাড়াবে প্রতিবেশী রাজ্যে।

হরিয়ানায় হ্যাটট্রিক বিজেপির

পানিপথের রাজ্যে নির্ণায়ক জয় পেল ভারতীয় শক্তি

সৌভিক দত্ত

হরিয়ানা এবং জম্মু-কাশ্মীর দুই জায়গাতেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের জয়। হরিয়ানা বুঝেছে যে হিন্দুত্বের থেকে জাতপাত বড় নয়। আর জম্মু-কাশ্মীরের পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনকিছুই হিন্দুত্বের থেকে বড় নয়। হিন্দুত্বই একমাত্র উড়িয়ে দিতে পারে দেশবিরোধী কংগ্রেসকে।

হরিয়ানা ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক দুই ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই হরিয়ানাতেই (পানিপতে) একবার না, দুবার না, পরপর তিনবার ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল। এবং হরিয়ানা এর মধ্যে কোন বারই কিন্তু ভারতের সঙ্গ দেয়নি। প্রথম পানিপথের যুদ্ধ না হয় দুটি বিদেশি শক্তির মধ্যে হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারের যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় পক্ষ বিধ্বস্ত হয়েছিল এই হরিয়ানার মাটিতেই। পরিণামে মোগল এবং ব্রিটিশ (মারাঠাদের দুর্বলতার সুযোগে) পরাধীনতায় বন্দি হতে হয়েছিল আমাদের।

ইতিহাসের সেই পরম্পরা ধরে ২০২৪ সালের হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনকে যদি তেমনি গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্ণায়ক সংগ্রাম বলা যায়, তবে হয়তো খুব একটা হবে না।

দেশবিরোধী শক্তিগুলো এই ভেবে উল্লসিত হয়েছিল যে, লোকসভা নির্বাচনে কিছুটা শক্তি কমে যাওয়া বিজেপিকে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে রক্ত ঝরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কাজ করছিল অসম্ভব দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ভয়। ভারতীয় জনতা পার্টির আবার পূর্ণশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় স্বাভিমানের অস্তিত্বের প্রশ্ন। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ও তাদের বিরোধী সবাই এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল। আর সেজন্যই ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পরে হওয়া এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন কোন অংশেই লোকসভা নির্বাচনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আর সেই জন্য সবদিক থেকে এই নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতিও ছিল তুঙ্গে। সাংগঠনিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়াও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল এই নির্বাচনে। নির্বাচনের বহু আগে থেকেই এক্সিট পোলের নামে বারবার দেখানো হচ্ছিল যে এই নির্বাচনে বিজেপি হেরে যাবে। কংগ্রেসকে এখানে একরকম জিতিয়ে দিয়েছিল কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিডিয়াগোষ্ঠী। এবং হয়তো অনেক মানুষ সেটা বিশ্বাস করে হতাশ হয়েও পড়েছিল। হরিয়ানাতে অবশ্য বিজেপির জন্যে ভয়ের যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রথমত এখানে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বিজেপির সরকার আছে। দীর্ঘদিন ধরে কোন সরকার ক্ষমতায় থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার একটা হাওয়া অবশ্যই ওঠে। তেমন কোনো কারণ না থাকলেও মানুষ অনেক সময় চায় অন্য একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে পরখ করে দেখতে।

এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার উপর ভরসা করে অনেক মিডিয়া এবার কংগ্রেসকে প্রায় ক্ষমতায় নিয়েই এসেছিল। ভয় ছিল জাতপাত নিয়েও। জাতীয়তাবাদী শিবিরের অন্যতম ভরসার জায়গা হচ্ছে হিন্দু ঐক্য। জাতপাত নামক ভারতের এই অভিশাপটি যত দুর্বল হবে, ভারতবর্ষ এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি তত বেশি শক্তিশালী হবে। আর এটা বুঝেই লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপির বিরোধী

শক্তিগুলি বারবার ভারতের জাতপাতকে উসকে দিচ্ছিল। দাবি উঠছিল জাতভিত্তিক আদমশুমারিরও। হরিয়ানা ভোটেও জাতপাত নিয়ে হিন্দু ঐক্য নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল মারাত্মক। এবং এই জাতপাত যে কতটা ভয়ংকর তা হয়তো বাঙালিদের থেকে আর ভালো কেউ জানে না। ৪৭-এ দেশভাগের সময়ও বাঙালিদের এই জাতপাতে বিভাজিত করে পাকিস্তানকে অনেক বেশি ভূখণ্ড পাইয়ে দিয়েছিল মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্টরা। এইবারও দেশবিরোধী শক্তিরা একই চাল চেলেছিল জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতবাসী প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই ভারত একেবারে নতুন ভারত। এতদিন ধরে যে ভুল আমরা করে এসেছি, এই নতুন দিনে আর সেই ভুল আমাদের হবে না। ৯০ আসনের এই রাজ্যে ৪৮টি আসনে জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। পরপর তিনবার হরিয়ানা জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করল ভারতীয় জনতা পার্টি। কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে আছে মাত্র ৩৭টি আসন পেয়ে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বাল্মীকি জয়ন্তীর দিনটিকে। উপস্থিত ছিলেন মোদী, শাহ, রাজনাথ সিংহ-সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। ছিলেন এনডিএ-র সব মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন নায়াব সিং সাইনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত মার্চেই সাইনিকে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এই জয় ছিল সাইনির নিজের ব্যক্তিগত মুখরক্ষার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই হরিয়ানা থেকেই কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু কৃষকরাও যে বিজেপির সঙ্গে আছে, এটা হরিয়ানা প্রমাণ করে দিল। এই জয় আগামী নির্বাচনগুলিতে বিজেপিকে লড়াইয়ের অনেকটা মনোবল যোগাবে। প্রায় ৫০ হাজার দর্শকের হর্ষধ্বনি এবং স্লোগানের মধ্যে চলে সাইনির শপথ। এই মন্ত্রিসভা অন্যান্য কিছু রাজ্যের মন্ত্রিসভার মতো যাতে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হয়ে ওঠে তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জাতপাত, সম্প্রদায় থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, সব ক্ষেত্রেই ভারসাম্য রাখার চেষ্টা হয়েছে এখানে। দলিত, ওবিসি, জাঠ, রাজপুত, পঞ্জাবি, বানিয়া, ব্রাহ্মণ— প্রত্যেক গোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে মন্ত্রিসভায়। হরিয়ানার মন্ত্রিসভা প্রকৃতপক্ষে নতুন এক ভারতের বার্তা দিল যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটা জাতের ও প্রতিটা সম্প্রদায়ের সমান অধিকার থাকবে। সব মিলিয়ে বলা যায় পানিপতের রাজ্য হরিয়ানা, এইবার কিন্তু ভারতবর্ষকে নিরাশ করেনি।

হ্যাঁ, নিরাশ অবশ্য করেনি জম্মু ও কাশ্মীরও। এখানে হয়তো বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারেনি, তবে জম্মু-কাশ্মীর সারা

ভারতবর্ষকে শিখিয়ে দিয়েছে অনেক কিছুই। ক্ষমতায় আসতে না পারলেও জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এত চেষ্টা করেও হরিয়ানা বা জম্মু-কাশ্মীর কোথাও কিন্তু বিজেপিকে হারাতে পারেনি কংগ্রেস। জম্মু ও কাশ্মীরে শেষবার বিধানসভা নির্বাচন হয় ২০১৪ সালে। সেবার কংগ্রেস ১২টি আসনে জিতেছিল। এবার জিতেছে মাত্র ৬ টি আসনে। ওমরের দলের সঙ্গে জোটে আছে বলেই তারা সরকারে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশ ফিকে হয়ে আসাটা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য অবশ্যই একটি শুভ লক্ষণ।

বিগত বছরের গুলিতে কেন্দ্র সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় উপত্যকার উন্নতি হয়েছে অভাবনীয়। যার প্রভাব পড়েছে এবার উপত্যকার ভোটদানের হারেও। এত বিশাল সংখ্যক মানুষ আগে কখনোই কাশ্মীরে ভোট দিতে আসেনি। একসময় যে উপত্যকায় ৮%- ১০% ভোট পড়তো, সেখানে এবার ভোটের পরিমাণ ৬০% ও ছড়িয়ে গেছে। এছাড়া অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জঙ্গি দমন, স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে কাশ্মীরকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা - কাশ্মীরের জন্য কম করেনি বিজেপি সরকার। মোদী সরকারের মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। অর্থাৎ ধর্ম বর্ণ সবকিছু নির্বিশেষে কাশ্মীরের উন্নয়ন।

জম্মু ও কাশ্মীর মিলিয়ে ৬৩টি আসনে রয়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা এবং ২৭টি আসন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ (অবশ্য এর মধ্যে আছে রেসি, যেখানে দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রায় সমান জনসংখ্যা আছে)। বিজেপি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মুতে রেকর্ড ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে, ২৭টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে জিতেছে। অর্থাৎ, বলা যায় যে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ৭০% আসনই কিন্তু ছিল বিজেপির জন্য চ্যালেঞ্জিং। বিষয়টা নিয়ে হয়তো ভারতীয় জনতা পার্টির থিঙ্ক ট্যাংকদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। শেষে এই কথাই বলা যায় যে হরিয়ানা এবং জম্মু-কাশ্মীর দুই জায়গাতেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের জয়। হরিয়ানা বুঝেছে যে হিন্দুত্বের থেকে জাতপাত বড় নয়। আর জম্মু-কাশ্মীরের পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনকিছুই হিন্দুত্বের থেকে বড় নয়। যে কারণে হিন্দু অধ্যুষিত আসনে বিজেপি ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারেনি সেখানকার অধিবাসীরা। আশা করা যায় এই শিক্ষা আগামী সমস্ত বিধানসভার নির্বাচনগুলোতে পথ দেখাবে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে।

বাংলা ভাষার 'ধ্রুপদী' মর্যাদা প্রাপ্তি

ভারতীয়ত্বের পুনর্জাগরণ

কৌশিক কর্মকার

এই সেই বাংলা ভাষা যার ধ্রুপদী মর্যাদার জন্য গত ৭৭ বছরে কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল সরকার কোথাও কোনও জোরালো দাবী বা আন্দোলন করেনি। অবশেষে সেই মর্যাদা এল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। যে বাংলাকে পাকিস্তানের মধ্যে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সেই বাংলার ভাষাই ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেল তাঁরই উত্তরসূরি নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে।

কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন ধারণ করে সেই জাতির ভাষা। লিখিত রূপ প্রাপ্তির আগে ভাষা বাহিত হয় মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে। সেই কারণেই লোককথা, লোকগান, ছড়া, প্রবাদ প্রবচনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে জাতির চিন্তা চেতনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আজ থেকে আট দশক আগে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের কথা। অবনীন্দ্রনাথ অনুমান করতে পেরেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে এই ব্রতগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই ব্রতগুলি হল বাঙালির আত্মপরিচয়, বাংলার নিজস্ব সম্পদ; যেগুলি কয়েক হাজার বছর ধরে, আর্যপূর্ব সময় থেকে এই বাংলার মাটিতে আচরিত, পালিত হয়ে আসছে নিষ্ঠাভরে। কিন্তু আজ নাগরিক সভ্যতা তো বটেই, গ্রামীণ সমাজ থেকেও অন্তর্হিত হয়ে গেছে ব্রত পালনের অভ্যাস। অবনীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন বলেই সংকলন করে রেখেছিলেন বাঙালির ইতিহাস, বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য বাংলার এই ব্রতগুলিকে; নতুবা আজ তা বিলীন হয়ে যেত চিরতরে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারত সরকারের এই ধ্রুপদী ভাষা স্বীকৃতি প্রকল্পের উদ্দেশ্যও কম বেশি এমনই। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও তার গৌরবময় ঐতিহ্য যা মূলত ভাষা নির্ভর; তার উপযুক্ত সংরক্ষণই হয়ে উঠুক ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণের চাবিকাঠি। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলি হোক বা উত্তর ভারতের আর্য ভাষাসমূহ, ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিই ধারণ করে আছে ভারতীয়ত্বের চিহ্ন, তার সুপ্রাচীন গৌরবের ইতিহাস। তাই সেই ভাষাগুলির প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষণের মাধ্যমে ভারতের অতীত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করে তোলাই ধ্রুপদী ভাষা প্রকল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য। বর্তমান জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকার প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার নিরন্তর চর্চার মধ্য দিয়ে দেশের নবপ্রজন্মকে তার শেকড়ের প্রতি, ভারতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে চায়। এ কারণেই ভাষিক ঐতিহ্য রক্ষার এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সাদরে।

উনিশ শতকে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয়দের হীনম্মন্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। যা কিছু উন্নত, যা কিছু আধুনিক সবই পাশ্চাত্যের অবদান; এই মতবাদ তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতীয় মননে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতা উৎকৃষ্ট ও তার ভারতীয় প্রতিরূপ নিকৃষ্ট; এহেন পরিকল্পিত প্রচারণার মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক প্রক্ষালনের একটি পরিকল্পিত প্রয়াস রচিত হয়। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনে তৎকালীন সময়ের সুধীজনেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধে তারই অনুরণন শোনা যায়: '১৮৩৫ খৃঃ অব্দে মেকলে সায়েবের কৃপায় প্রাদেশিক ভাষাগুলি স্কুলে কলেজে হতাদৃত হইয়াছে তৎসঙ্গে, সংস্কৃতের চর্চ্চাও হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে যে শত শত পুস্তক লিখিত হইতে ছিল, সেই প্রচেষ্টা একেবারে থামিয়া গিয়াছে। ··· বাঙ্গলা ভাষাকে উপেক্ষা করার দরুণ, এদেশের খাঁটি সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয়ই হয় নাই। যে শিশু রামায়ণ মহাভারত পড়ে নাই- তাহার পক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বার বদ্ধ। সে এদেশের কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা, কবি, জারি- এসকলের কিছুর মধ্যে নাই। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে পূর্ব্বেই দেশের খাঁটি সংস্কৃতির দ্বারা ভিত গড়িতে হইবে তারপর বিদেশী ভারতীয় সেবা করিয়া সেই উপকরণে দেশের বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই দেশের শিক্ষার অবনতি হইয়াছে, অধুনা তাহার মধ্যে অনেক যোগ, অনেক বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন আদর্শ নবভাবে দাঁড় করাইতে হইবে। কিন্তু বিদেশী ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞতা জনিত কুসংস্কারে দেশীয় সম্পদকে অগ্রাহ্য করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না, বিকৃত হইবে'।১

এর পরবর্তী সময়ে এসেছে আরেক বিজাতীয় বিদেশি রাজনৈতিক মতবাদ যা বিদেশে পরিপুষ্ট, বিদেশের মুখাপেক্ষী, বিদেশের আদর্শে আদর্শায়িত। দুটি বিদেশি রাষ্ট্র তাদের একমাত্র আদর্শ; ভারতীয়ত্বকে নিরন্তর অপমান ও হেয় করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তাদের আদর্শ রাষ্ট্রেই আজ তাদের মতবাদ পরিত্যক্ত। এই ব্যর্থ রাজনৈতিক মতবাদ বর্তমানে সারা পৃথিবীতে পরিত্যাজ্য হয়েছে। তারা যতই তাদের পরিভাষানির্ভর, বাক্সর্বস্ব মতের সপক্ষে ওকালতি করে, ততই তাদের কঙ্কালসার চেহারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ধ্রুপদী বাংলা ভাষা নিয়ে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা মহাশয়।

আজ যখন ভারতীয়ত্বের উদ্যাপনের সময় সমাগত হয়েছে, তখন সকল ভারতীয়ের দায়িত্ব হোক ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, সংকলন ও সংস্থাপন।

আলোচ্য নিবন্ধের ভূমিকা অংশে যেমন উল্লিখিত হয়েছে লিখিত রূপ প্রাপ্তির আগে ভাষা মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে বাহিত হয়, ঠিক সেভাবেই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন হিসেবে এযাবৎ কাল বিবেচিত হয়ে এসেছে চর্যাগীতি। যদিও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে বহুতর ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেছেন চর্যাগীতির ভাষা বাংলা, তবুও ওড়িয়া ও অসমিয়া ভাষাবিদ্রাও তাঁদের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে চর্যাগীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে থাকেন। কারণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বা কথ্য সংস্কৃত থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা প্রাকৃতের স্তর পেরিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকরা যেখানে উপনীত হন, তা হল মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠ নামক একটি কল্পিত ভাষার স্তর যা ষষ্ঠ শতক নাগাদ বিকাশ লাভ করেছিল। ভাষাবিদ্দের মতে এই অনুমিত মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠের পূর্বী শাখা থেকেই বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়ার উদ্ভব আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। সেক্ষেত্রে চর্যাগীতির সময়কাল হিসেবেও এই সময়টিই বিবেচিত হয়ে থাকে। একমাত্র ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যার রচনাকালকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরাপর ভাষাবিদ্দের মতে তা আরও পরবর্তী সময়ের ফসল। আজকে যে সংস্কৃত-চিনা অভিধানটির কথা উঠে আসছে, যেখানে বহু সংখ্যক বাংলা শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে, সেই অভিধানটির বিষয়ে শহীদুল্লাহ ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন: 'সপ্তম শতকের যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল, তাহার একটি বাহ্য প্রমাণ আছে। এই সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে "আগচ্ছ" এর প্রতিশব্দ "আইশ" (অইশ) লেখা হইয়াছে। এই "আইশ" শব্দ বাঙ্গালা। ইহাতে আরও কয়েকটি প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ আছে, যথা, -লই (লইয়া), ফেড় (দূর কর), পহ্ণ (পরা), বেশশ্(বসা), মোট্ট (মোটা)। অষ্টম শতকের একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায়- আট (আটা), চোল (চাউল), মুগ, খট (খাট), মস (মাছ), হট (হাট), এহ (এই),

মইশ (বইশ, উপবেশন কর), ভাতার (স্বামী), মোট্ট (মোটা)।'২ অর্থাৎ কথ্য ভাষায় এই শব্দগুলির ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। কাজেই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা হিসেবে 'বাংলা'র উদ্ভবের আগেও এতদ্দেশে এই শব্দগুলির যে বহুল ব্যবহার ছিল, তা ধরে নেওয়া যায়। যে কারণেই বাংলা ভাষায় রয়েছে অস্ট্রিক ভাষা বংশের অসংখ্য শব্দ; যে শব্দগুলি সাধারণভাবে 'দেশি শব্দ' হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। চর্যাগানেও রয়েছে অসংখ্য অস্ট্রিক শব্দ। তবে কেবল শব্দ ব্যবহার নয়, বাংলা বাক্যের অন্বয় অর্থাৎ পদক্রম, ধ্বনিতত্ত্ব বাগ্রীতি সকলই অস্ট্রিক প্রভাবজাত; বাংলা ভাষার প্রাথমিক নির্মাণ কর্ম আদিবাসী প্রাচীন জনগোষ্ঠীর দ্বারা ঘটেছিল।৩ পরবর্তী সময়ে বঙ্গভূমিতে আর্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আগমনের পর এহেন অস্ট্রিক শব্দভাণ্ডার বা অন্বয় রীতি সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করে পরিবর্তন লাভ করে। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকেদের মৌখিক ভাষার সঙ্গে আর্যদের মৌখিক ভাষার মিশ্রণ ঘটতে আরম্ভ করে এবং অনার্যদের ভাষাগুলোর অল্পবিস্তর শব্দ এবং বাক্যাংশ আর্যদের ভাষায় ঢুকে পড়ে বঙ্গভূমিতে আর্য এবং অনার্যদের ভাষা মিশে একটি নতুন ভাষা গড়ে ওঠার ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল এভাবেই।৪

জাতি হিসেবে বাঙালির প্রাচীনত্বের পরিচয় দ্যোতক আরো কিছু প্রমাণ ইতিহাসে লভ্য। ঋগ্বেদের শ্লোক 'প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুঃ' (৮.১০১.১২) অর্থাৎ যে তিন জাতি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, তার ব্যাখ্যা হিসেবে আনুমানিক প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিখিত ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ>মগধ ও চেরপাদ, এই তিন জাতি 'বয়াংসি' অর্থাৎ পক্ষী জাতির বংশধর। সুকুমার সেন এই রূপকার্থের অর্থ করেছেন 'যাযাবর'৫। সুহৃদকুমার ভৌমিক এর দুটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: 'এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলছেন ওই সময়ের বাঙালিরা কোন ভাষাগোষ্ঠীর লোক ছিল বলে সংস্কৃত-জাত ভাষায় বা ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষায় কথা বলত না। তাই সেই দুর্বোধ্য ভাষার মানুষকে তাঁরা কিচমিচ করা পাখিই বলেছিলেন- তাই তারা বয়াংসি। কিন্তু তা না-ও হতে পারে। বঙ্গ, মগধ এবং বর্তমান চেরোজাতি অধ্যুষিত চেরোপাদ অর্থাৎ সমগ্র পালামৌ অঞ্চল জুড়ে নিবিড় ভাবে বাস করত খেরোয়াল জাতিসমূহ- অর্থাৎ কোল ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, খেড়িয়া, খেরোয়াল, অসুর প্রভৃতি জাতি··· যাঁরা তাঁদের পুরাণ অনুসারে মনে করেন তারা হলেন খেরোয়াল; খের অর্থাৎ পাখির বংশধর। ঋষি ঐতরেয় মহীদাস বয়াংসি বা খেরোয়ালদের কথা ভোলেননি। তার কারণ আর কিছুই নয়, ঋষি মহিদাস ঋষিপুত্র হলেও তাঁর মা ছিলেন ইতরা বা শূদ্রজাতীয়া রমণী- সম্ভবত কোল জাতির সঙ্গে ছিল তাঁর রক্তের সম্পর্ক। তাই তাঁর নাম ঐতরেয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পূর্বে বঙ্গদেশ বা বঙ্গজাতির কোন উল্লেখ নাই।'৬ অর্থাৎ প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই বঙ্গজাতির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ঐতিহাসিক উপাদানে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় ও ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বেশ কিছু শব্দের (পুডনগলতে, সংবগিয়ানং, গণ্ড) সন্ধান পাওয়া যায় যা বঙ্গজাতির প্রাচীনত্বের প্রমাণ রাখে। 'পুডনগলতে' অর্থ পুন্ড্রনগর (পরবর্তীকালে পৌণ্ড্রবর্ধন) বাংলার প্রাচীন জনপদ। 'সংবগিয়ানং' অর্থে 'সংবগ্যীয়' বা 'সংবঙ্গীয়'। 'গণ্ড' নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, কড়ি বা মুদ্রা;৭ নীহাররঞ্জন রায় যার ব্যাখ্যা করেছেন এরূপ: 'গণ্ডক মুদ্রায় কিছু অর্থ সংবঙ্গীয়দের (ছবঙ্গীয়দের?) নেতা (?) গলদনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, ঋণ হিসাবে।'৮ খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই এই ভৌগোলিক খণ্ডে বঙ্গদেশের অধিবাসীদের বসবাসের প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

২০০৪ সালে প্রথম তামিল ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সে সময় ধ্রুপদী ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে মানদণ্ডগুলি রাখা হয়েছিল সেগুলি ছিল এরূপ: সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন নিদর্শন, কয়েক প্রজন্ম ব্যাপী মান্যতা প্রাপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য, নিজস্ব সাহিত্যিক পরম্পরা যা অন্য কোন ভাষা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণকৃত নয়। ২০০৫ সালে শর্তাবলী খানিকটা পরিবর্তিত হয়; ভাষার প্রাচীন নিদর্শনের প্রাচীনত্বের সময়সীমা এক হাজার থেকে বাড়িয়ে দেড়

বাংলা ভাষা চর্চা নিয়ে কলকাতায় গুনীজন সানিধ্যে জেপি নাড্ডা।

হাজার বা দু'হাজার করা হয়, পুরনো শর্তাবলীর সঙ্গে যোগ করা হয় একটি নতুন শর্ত: প্রাচীন ভাষা সাহিত্য তার আধুনিক রূপ থেকে পৃথক হবে; উভয় রূপের মধ্যে একটি প্রবাহমানতার ছেদ বা বিরতি (discontinuity) থাকতে পারে। ২০২৪ সালে বলা হয় কাব্য, শিলালিপি ও প্রত্নলিপিগত প্রমাণের পাশাপাশি প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের নথিও এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে।

২০২৪ সালে আরও চারটি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হল, এহেন মর্যাদা লাভে বাংলা ভাষার লাভ কোথায়? ভারত সরকারের প্রকাশিত নথি জানাচ্ছে এর আগে যে ভাষাগুলি ধ্রুপদী মর্যাদা লাভ করেছে সেগুলির উন্নয়নে সরকার অর্থ সাহায্য দান করেছে অকাতরে।৯ উন্নয়ন অর্থে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? সর্বাগ্রে যে বিষয়টির কথা আসে তা হল ভাষার সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ অর্থাৎ বাংলা ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত যাবতীয় প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ সর্বাধুনিক উপায়ে সংরক্ষণ করা বা ডিজিটাইজ করা; বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধ করা। ভাষিক ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান, উৎসব, লোকাচারের সংরক্ষণ ও অনুসারী পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানো এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। আর এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞ সূচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য নিযুক্ত হবেন নিবেদিত গবেষকবৃন্দ, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রত্নতাত্ত্বিক, অনুবাদক, সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী, ইভেন্ট ম্যানেজার, পুস্তক প্রকাশক প্রমুখ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞবর্গ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হবেন 'চেয়ার প্রফেসর', তৈরি হবে নির্দিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের পুরস্কার প্রদান করা হবে। এক কথায় কেবল বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থানের এক সুবৃহৎ পরিসর নির্মিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ছাত্র-যুবদের সামনে যেন এক বিরাট কর্মজগতের সম্ভার হাজির করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার। ভারত সরকারের এই মহতী প্রয়াসে আপামর বাংলাভাষী অঞ্চল কৃতজ্ঞ ও ধন্য।

স্বভাবতই ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির পর ভাষিক-সংস্কৃতিক জগতে যেমন পরিবর্তন আসবে, তেমনই কর্মসংস্থানের দুনিয়ায় বহু নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের উন্মোচন ঘটবে। এরকম অবস্থায় কৃতিত্বের ভাগীদার হওয়ার লড়াই অনিবার্যভাবে চলে আসে, শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। বস্তুত আজ থেকে দু'দশক আগে তামিল ভাষা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। তারপর একে একে দ্রাবিড় ভাষা বংশের সব কটি মূল ভাষাই ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পায়। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ওড়িয়াও ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে আজ থেকে এক দশক আগে, ২০১৪ সালে। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তামিলের ধ্রুপদী স্বীকৃতি লাভের পর দীর্ঘ এক দশক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত সময়ের মধ্যে বাংলাকে ধ্রুপদী মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুলতে অসমর্থ হয়েছিল। আর তাদের শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার উপর এক পরিকল্পিত আক্রমণের সূচনা ঘটেছে। পাঠ্যপুস্তকে রামধনু পরিবর্তিত হয়ে গেছে রংধনুতে, দাড়িভিটের স্কুলে উর্দুর বদলে বাংলার শিক্ষক চেয়ে নিহত হয়েছেন দুই কলেজ-ছাত্র: রাজেশ-তাপস। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে লিখিত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রবন্ধে দুশ্চিন্তার বার্তা ব্যক্ত হয়েছিল, পরিস্থিতি তখনও ছিল উদ্বেগজনক; কিন্তু প্রাজ্ঞ দীনেশবাবু বিশ্বাস রেখেছিলেন এক তরুণ নেতার প্রতি, এক দক্ষ প্রশাসকের প্রতি, আজকের দিনেও যা আমাদের ভরসা জোগায়, আশার আলো দেখায়: 'বাঙ্গলা ভাষা এবার শিক্ষার বাহন হইল, কিন্তু প্রাচীনের সঙ্গে বর্ত্তমানের যে চিরন্তন অচ্ছেদ্য যোগ আছে, তাহা যাহাতে দূটীভূত হইয়া জাতীয় সংস্কৃতি অগ্রসর হয় সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখার দরকার হইবে। এই বিষয়ে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যক্ষ প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে আরও বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। আপাততঃ বি এ অনার্স বাঙ্গলায় প্রবর্তিত হইলে ছেলেরা মাতৃভাষার প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা পাইবে, নতুবা এম এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে যাইয়া তাহাদিগকে অনেকটা পথ ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যে হাতে খড়ি পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে একেবারে বড় একটা রাস্তায় প্রবেশ করিতে হয়, তারা সেই পথের খেই পাইয়া উঠে না। এজন্য উর্দ্দ প্রভৃতি অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার দাবী আছে, তাহা আমরা জানি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবও আছে, কিন্তু বিঘ্ন ও অসুবিধা সঙ্কুলে এ পথ পাড়ি দেওয়ার যোগ্য কাণ্ডারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে।'১০

তথ্যসূত্র:

১। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বাঙ্গলা ভাষার অতীত ও ভবিষ্যৎ', ঈশানী দত্ত রায় (সম্পা.), আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবন্ধ ও কবিতা শতবর্ষ সংকলন, এবিপি প্রা: লি:, কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৯

২। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৭

৩। সুহৃদকুমার ভৌমিক, বাঙলা ভাষার গঠন, বইপত্তর, কলকাতা, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৮

৪। গোলাম মুরশিদ, বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০, পৃষ্ঠা ১৩

৫। সুকুমার সেন, বঙ্গ ভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪

৬। সুহৃদকুমার ভৌমিক, ২০২১, পৃষ্ঠা ৩১

৭। সুকুমার সেন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

৮। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮৭, পৃষ্ঠা ২০৭

ছবিতে খবর

বীরভূম জেলা সদস্যতা অভিযানের কর্মশালায় রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

ভারতীয় জনতা পার্টি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাদের নিয়ে সদস্যতা অভিযানের বৈঠকে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে, গত ২০১১ থেকে ২০২৪ এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহিলাদের উপর ক্রমাগত হিংসা, ধর্ষণ এবং অন্য সমস্ত অপরাধের বিবরণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হল 'ব্ল্যাক পেপার'।

উত্তর কলকাতা জেলার সদস্যতা অভিযানের পরিকল্পনা বৈঠকে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

ভারতীয় জনতা পার্টির মেদিনীপুর জেলার কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

ফরাক্কায় ৯ বছরের শিশুকন্যার ধর্ষণ ও নির্মম হত্যার প্রতিবাদে ফরাক্কা থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতি ফাল্গুনী পাত্র মহাশয়া সহ জেলা নেতৃত্ব।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ের উচ্ছ্বাস পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে।

ব্যারাকপুরে সদস্যতা অভিযান পরিকল্পনা বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গাপুজোয় অভয়ার বাড়িতে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

শিয়ালদহ স্টেশনে রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, রাজ্যসভা সাংসদ শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, রানাঘাটের সাংসদ শ্রী জগন্নাথ সরকার এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী দেবশ্রী চৌধুরী।

ছবিতে খবর

বেলুড় মঠে সপ্তমীর মহাক্ষণে অঞ্জলি দিচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জে পি নাড্ডা এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে সম্মানিত করার জন্যে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে গুণীজনদের থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দ্যেশে ধন্যবাদ পত্র গ্রহণ করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা মহাশয়।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোয় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জেপি নাড্ডা মহাশয়।

আরজি কর কাণ্ডে অভয়ার বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ডাকে কালীঘাট চলো কর্মসূচি।

রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বগণ।

রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভার সাংগঠনিক সভায় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

কোচবিহার জেলার সিতাই বিধানসভার সাংগঠনিক সভায় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

জলপাইগুড়ি জেলার সাংগঠনিক বৈঠকে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল মহাশয়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক-বিধায়ক শ্রী দীপক বর্মন, সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়, বিধায়িকা শ্রীমতি শিখা চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়।

দঃ ২৪ পরগনার জেলার জয়নগরের কৃপাখালী এলাকায় চতুর্থ শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ও পুলিশি অপদার্থতার বিরুদ্ধে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে 'কুলতলী থানা চলো' কর্মসূচিতে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। 'বিজয়ার' বাড়ি গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন বিজেপি নেতৃত্ব।

কৃষ্ণনগর শহরে নির্যাতিতা কিশোরীর মৃত্যুর সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি তথা বিচারের দাবিতে পদযাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়কগণ ও জেলা নেতৃত্ববৃন্দ।

বঙ্গে কালী আরাধনা

স্বাজাত্যাভিমান ও স্বাধীনতা অন্বেষণের প্রতীক

বিনয়ভূষণ দাশ

দীপাবলী উৎসব অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাওয়ার উৎসব। তমসো মা জ্যোতির্গময়। রাজ্যের এই অমানিশার দিনে মা কালীর আরাধনার মাধ্যমে আমরা আবার যাতে আলোর পথে গমন করতে পারি। যে আলোকিত বাংলায় নির্ভয়ে থাকবে অভয়া, তিলোত্তমা, বিজয়ারা।

সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমগ্র ভারতের সাথে সাথে বাংলায়ও শক্তিপূজা প্রচলিত আছে। পাঁচ হাজার বৎসর আগের পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে দেবী পূজার প্রচলিত ছিল। ওই প্রাচীন শহর দুটির ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, ওই নগর দুটির অধিবাসীগণের উপাস্য ছিলেন কোনো দেবী। পরবর্তীকালে বৈদিক যুগেও শক্তি পূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তি পূজা আরও ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ' ভদ্রকালী ' নামটি রয়েছে। কয়েকটি বিখ্যাত হিন্দুতন্ত্রে কালী,তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা আছে। আবার বৌদ্ধতন্ত্র থেকে দেবীর উগ্রা,মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী,কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর Introduction to Buddhist Esotericism গ্রন্থে মতামত প্রকাশ করে লিখেছেন যে, বাংলায় জনপ্রিয় দেবীদ্বয় সরস্বতী ও কালী বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। অন্যদিকে মহাভারতে কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চন্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাশক্তি মূলা প্রকৃতি থেকে বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরা সত্তা।বৃহৎ নারদীয় পুরাণ দেবীকে সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিনীরূপে বর্ণনান্তে বলেন,

উমেতি কেচিদাহস্তাঙ্ শক্তিঙ্ লক্ষ্মীঙ্ তথা পরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাঙ্ গিরিজেতাম্বিকেতি চ।।

দুর্গে ত ভদ্রকালীতি চন্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে।।

এই শ্লোকেও ভদ্রকালী দেবীর নাম পাওয়া যায়। আসলে শাক্ত ভাবের প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত করলেও বাংলাদেশে (অখন্ড বাংলা) এই শাক্ত ভাব বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে। বাংলার ধর্মসাধনায় দেবীভক্তি একটি প্রধান ধারা। এই ধারাতে শাক্ত মতে দেবীপূজা, অর্থাৎ দুর্গাপূজা ও কালীপূজা প্রধান। এই পূজাতে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ থেকে স্বাধীনতাকামী হিন্দু মহারাজা প্রতাপাদিত্য থেকে শুরু করে রাজা সীতারাম রায়।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লববাদী অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীগণ, ঋষি অরবিন্দের যুগান্তর দল। ঋষি অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির ' পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীগণ মা কালীর সামনে শপথ নিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মকান্ডে নেমে পড়তেন। বিপ্লবীদের জীবনী থেকে পাওয়া যায়, এমনকি মূর্তি পূজার বিরোধী ব্রাহ্ম বিপ্লবীগণও মা কালীর পূজায় আত্মনিবেদন করতেন। যুদ্ধের দেবী দুর্গা ও তাঁর আরও ভয়ঙ্কর কালী রূপের আরাধনা করতেন তাঁরা।

দেবী কালীর স্তুতিতে রচিত হয়েছে গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল, দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল নামের নানান কাব্য। এছাড়া সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণও মা কালীর স্তুতিতে অসংখ্য শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত শ্যামাসংগীত বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। এছাড়া দক্ষিণেশ্বর ও হালিশহরের পঞ্চবটীদ্বয় ও তারাপীঠাদি সাধনস্থল বাংলাকে তীর্থে পরিণত করেছে। সাধারণভাবে মা কালীকে দেবী দুর্গার আরো ভয়ঙ্কর রূপের প্রতীক বলে মনে করা হয়। যদিও, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদ উভয়েই একটি বাক্যেই মা কালীর স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন, ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। যিনি কালী, তিনিই ব্রহ্ম। আর রামপ্রসাদ বলেছেন, " কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

বাংলায় প্রথম কে কালীপূজা প্রবর্তন করেন সেবিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। সপ্তদশ শতকের নবদ্বীপের প্রথিতযশা তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাংলায় কালীমূর্তি ও কালীপূজার প্রবর্তক মনে করা হয়। তাঁর পূর্বে কালী উপাসকগণ তাম্রটাটে ইষ্টদেবীর যন্ত্র এঁকে বা খোদাই করে পূজা করতেন। যদিও ইতিহাসে আমরা পাই, বহিরাগত মোগলদের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাযোদ্ধা মহারাজা প্রতাপাদিত্য কালীসাধক ছিলেন । তিনি যশোরেশ্বরী

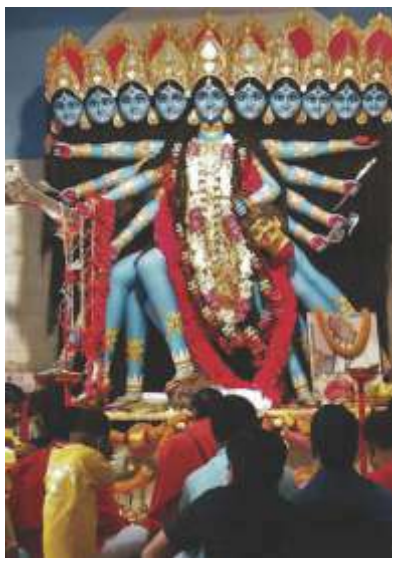

বিপ্লবীদের হাত ধরেই শুরু মালদার দশ মাথা কালী পূজা।

কালীর নিয়মিত উপাসনা করতেন। কৃষ্ণানন্দ নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। আর মহারাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সমসাময়িক ছিলেন। বস্তুত ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের অধীনে চাকুরী করতেন। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আগে থেকেই বাংলায় কালীপূজা প্রচলিত ছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাংলার সাধক সমাজ অনেকদিন চলেন নাই; লোকে 'আগমবাগিশী' কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীপূজাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এই সময় রামপ্রসাদ সেনও আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসারে কালীপূজা করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র ও বাংলার ধনী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালীপূজা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে কালীপূজা বাংলায় দুর্গাপূজার মতোই এক বিরাট উৎসব। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত তথা নব্যস্মৃতির স্রষ্টা রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার বিধান দিলেও, কালীপূজার উল্লেখ করেননি।

বাঙ্গালী চিরকালই শক্তি সাধনায় ব্রতী। শক্তি আরাধনা তার জীবনের অঙ্গ। কালীপূজার মাধ্যমে সমাজে সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রেরণা পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে রাজ্যে ঘটে চলা নারী নির্যাতন ও নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অনুপ্রেরণা আমরা মা কালীর আরাধনার মাধ্যমে পেতে পারি। সামাজিক বন্ধনও স্থাপিত হয়। কালীপূজার মাধ্যমে গুরুজনদের সম্মান করার আদর্শ স্থাপিত হয়। কালীদেবীর মূর্তি জ্ঞান, কর্ম,কর্মফল ও ত্যাগের তাৎপর্য তুলে ধরে। কালীপূজার মাধ্যমে মোক্ষলাভও হয়। কালীদেবীর কোমরের হাতগুলো কর্মের তাৎপর্য তুলে ধরে ও শ্মশানবাস জীবনের শেষ পরিণতিকে নির্দেশ করে। এছাড়া মুন্ডগুলো জ্ঞানের ধারক। এছাড়াও কালীপূজার বহু তাৎপর্য আছে যা তাঁর রূপের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। একই সাথে দীপাবলী উৎসবও পালিত হয়। দীপাবলী উৎসব অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাওয়ার উৎসব। তমসো মা জ্যোতির্গময়। রাজ্যের এই অমানিশার দিনে মা কালীর আরাধনার মাধ্যমে আমরা আবার আলোর পথে গমন করতে পারব এই আশায় এই প্রবন্ধের উপসংহার টানছি।

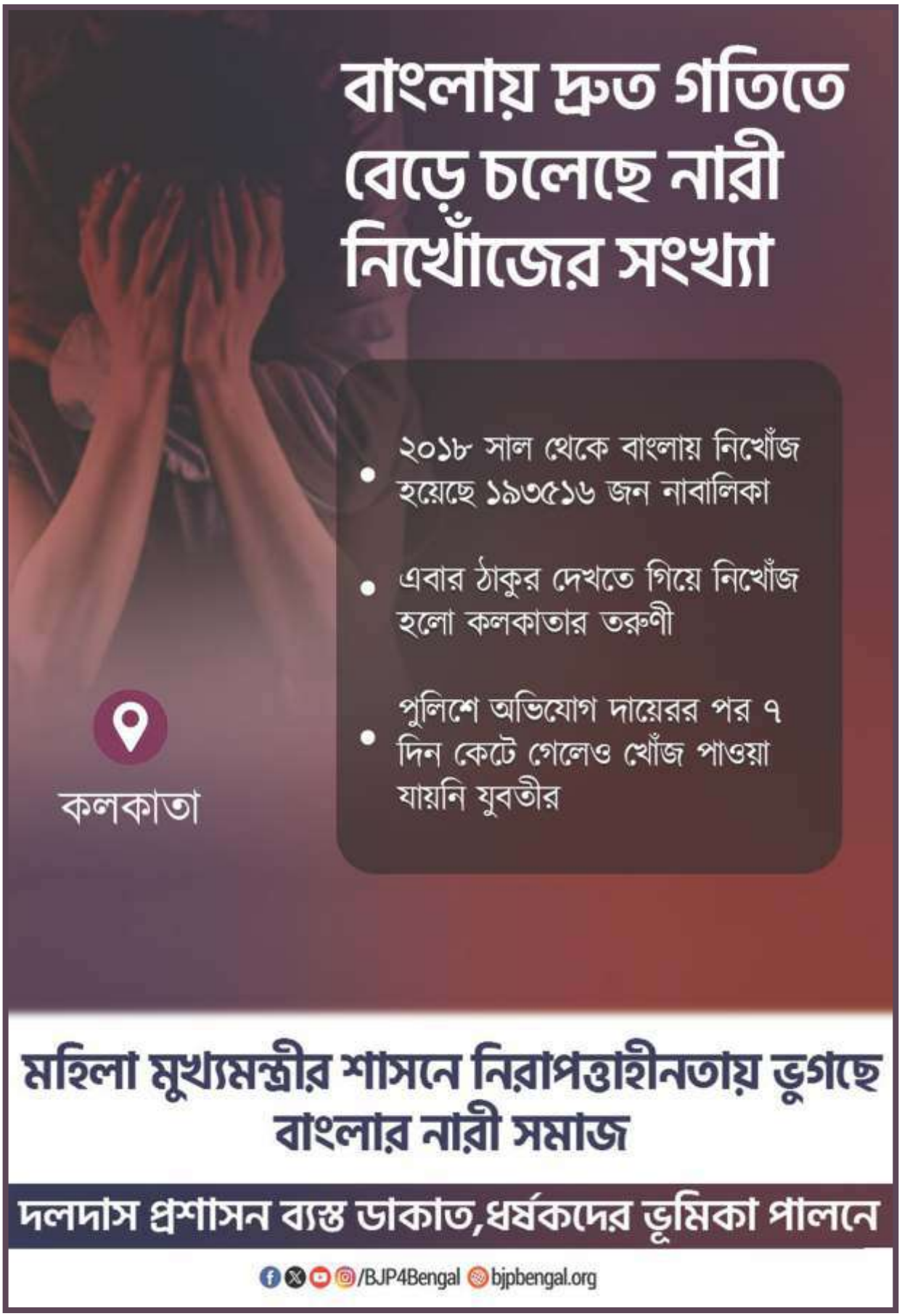
বাংলায় দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে নারী নিখোঁজের সংখ্যা
২০১৮ সাল থেকে বাংলায় নিখোঁজ হয়েছে ১৯৩৫১৬ জন নাবালিকা
এবার ঠাকুর দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হলো কলকাতার তরুণী
পুলিশে অভিযোগ দায়েরর পর ৭ দিন কেটে গেলেও খোঁজ পাওয়া যায়নি যুবতীর
কলকাতা
মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বাংলার নারী সমাজ
দলদাস প্রশাসন ব্যস্ত ডাকাত,ধর্ষকদের ভূমিকা পালনে
/BJP4Bengal
bjpbengal.org

১৯৪৬-এর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা

বাঙ্গালীর এক আতঙ্কের দিন

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

নোয়াখালির শচীন্দ্রকুমার ভৌমিক তাঁর চিঠিতে লিখছেন, "আমার গ্রামের চতুঃপার্শ্বের গ্রামে মুসলমানরা আগুন লাগাইয়া দেয়। বহু হিন্দু পরিবারকে মুসলমান করিয়া তাহাদের গোমাংস ভক্ষণ করান হয়। যে দু-একটি বড় বড় পরিবার ধর্মান্তর গ্রহণে অস্বীকার করে তাহাদের পরিবারের সকল লোককে কাটিয়া ফেলা হয়। যুবতী মেয়েদিগকে বলপূর্বক বিবাহ করা হয়। অনেক শিশুকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।...

বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা নিয়ে মেঘনার বাম তীরে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি জেলা। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের এই জেলাতে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮%। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন উৎসবমুখর হিন্দু বাড়িগুলিতে এক ভয়ংকর বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। গণহত্যা, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ব্যাপকহারে নারী ধর্ষণ, মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুসলিম লীগের প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা গোলাম সারওয়ার ছিলেন এই গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড। সুহরাওয়ার্দী সরকার মধ্যযুগীয় বর্বরতার এই খবরগুলি কিছুদিন চেপে রাখে। ১৬ই অক্টোবর "যুগান্তর" লিখছে "নোয়াখালি কলকাতার কলঙ্ককেও ম্লান করেছে। হাজার হাজার নিরীহ লোককে অমানুষিকভাবে হত্যা। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের ঔদাসীন্য। অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগের পর অন্যূন দশ হাজার লোক ধর্মান্তরিত। কয়েক সহস্র মহিলা অপহৃতা।" "যুগান্তর" ১৮ই অক্টোবর লেখে "পাঁচসহস্রাধিক নিহত ও অর্ধলক্ষাধিক বিপন্ন।"

গণহত্যার পূর্ব প্রস্তুতিঃ

১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই নোয়াখালি গণহত্যার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছিল। হিন্দুদের নানারকম হুমকি ও নির্যাতন করাও শুরু হয় এইসময় থেকে। গোলাম সারওয়ার ও তার দলবল গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিতে থাকে। কলকাতা দাঙ্গার মত নোয়াখালিতেও অশান্তি শুরুর অনেক আগে থেকেই মুসলিম লীগের শিলমোহরযুক্ত প্ররোচনামূলক বিভিন্ন পুস্তিকা বিলি করা শুরু হয়। "The People's Age" সংবাদপত্রটি ১৯৪৬-এর ২৭এ

অক্টোবর লেখে যে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে থেকেই সংগঠিত গুন্ডারা খোলাখুলিই অস্ত্রসংগ্রহ করতে থাকে এবং বহু গ্রামে কামারদের বাধ্য করা হয় তাদেরকে অস্ত্র তৈরী করে দিতে।

বাইরের জগতের সঙ্গে নোয়াখালির সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়। নোয়াখালি যাওয়ার সমস্ত রেলপথ উপড়ে ফেলা হয়। জলপথগুলিতেও কলাপাতা ও কচুরিপানা বিছিয়ে ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে রাখা হয়। বিভিন্ন যোগাযোগকারী রাস্তায় গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখা হয় ও নৌকা ছাড়ার জায়গাগুলোতে যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। হিন্দুদের দ্রুত সাহায্যর আর্জি জানিয়ে পাঠান টেলিগ্রামগুলো পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের মুসলিম কর্মচারীরা আটকে রাখে। পুলিশ ছাড়া কোন উদ্ধারকারী দলের পক্ষে নোয়াখালির প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি পৌঁছান ছিল অসম্ভব। (ভি.পি. মেনন, 'The Transfer of Power in India', পৃ-৩২২; সুরঞ্জন দাস, 'Communal Riots in Bengal 1905-47', পৃ-১৯৯)।

ভয়াবহ গণহত্যা শুরুঃ

১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার দিন, বৃহস্পতিবার গোলাম সারওয়ার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহাপুর ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রায় ১৫,০০০ মুসলিম জনতার সামনে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেন। এরপরেই গণহত্যা শুরু হয়ে যায়। নোয়াখালির পীড়িতদের গান্ধীজী ও প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচারের বিষয়ে লেখা বেশ কিছু হৃদয়-বিদারক চিঠি পাওয়া যায়। কয়েকটির অংশবিশেষ উল্লেখ করলে নোয়াখালির মানুষদের ওপর হওয়া অত্যাচারের মাত্রাটা হয়ত কিছুটা অনুমান করা যাবে। জনৈক হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী লিখছেন, "১৭ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুমান রাত্রি ১১টার সময় ৮-১০ জন মুসলমান গুন্ডা বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া আমার বৃদ্ধ খুড়োমহাশয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীকে (তিনি আজীবন বটগ্রাম উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক ছিলেন) তাঁহার ঘরের সম্মুখ হইতে জোর করিয়া এই বলিয়া টানিয়া লইয়া যায়- "তুমি মুসলমান হইয়াছ, কিন্তু এখনও দুর্গানাম ছাড় নাই। তোমার একখান চিঠি আমার হাতে ধরা পড়িয়াছে। তাহার প্রারম্ভে শ্রীদুর্গা নাম লেখা আছে, তোমাকে দুর্গার সঙ্গে বলি দিব।"... আমার খুড়োমহাশয়কে দুর্বৃত্তগণ ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন- "বাপু, তোরা অনেকে আমার ছাত্র, আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দে, আমার অপরাধ মার্জনা কর।" কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁহার কোন কথা কর্ণপাত করে নাই... জনরবে শুনা যায় তাহাঁকে কাটিয়া দক্ষিণ যুগীবাড়ির সম্মুখের পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কবর দেওয়া হইয়াছে।" উপেন্দ্রচন্দ্র গোপ লিখছেন যে, তাঁর পুরো পরিবারকে জোর করে ধর্মান্তরিত করার পর তাদেরকে দিয়ে একটি গরু জবাই করান হয় এবং জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে জোর করে বিবাহ দেওয়া হয়। গ্রামের অন্যান্য পরিবারেও একই ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানাচ্ছেন। জনৈক পরিমল চন্দ্র বোসের বাড়ি আক্রান্ত হলে তিনি কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে পাশের পুকুর ধারে আশ্রয় নেন। তিনি লিখছেন, "সেখান হইতে আমি দেখিতে পাইলাম দুর্বৃত্তগণ আমার ৩ বৌদি ও ৩ বোনকে কাটিয়া ফেলিল এবং আমার ৬ জন ভ্রাতুষ্পুত্রকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। দুর্বৃত্তগণ আমার তিন ভাইকে বাঁশ দিয়া মারিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।"। নোয়াখালির শচীন্দ্রকুমার ভৌমিক তাঁর চিঠিতে লিখছেন, "আমার গ্রামের চতুঃপার্শ্বের গ্রামে মুসলমানরা আগুন লাগাইয়া দেয়। বহু হিন্দু পরিবারকে মুসলমান করিয়া তাহাদের গোমাংস ভক্ষণ করান হয়। যে দু-একটি বড় বড় পরিবার ধর্মান্তর গ্রহণে অস্বীকার করে তাহাদের পরিবারের সকল লোককে কাটিয়া ফেলা হয়। যুবতী মেয়েদিগকে বলপূর্বক বিবাহ করা হয়। অনেক শিশুকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।... পার্শ্ববর্তী গ্রামে যখন আগুন লাগে তখন ঐ সকল গ্রাম হইতে বহু আশ্রিত আমাদের গ্রামে আশ্রয় লয়। তাহাদের নিকট শুনিতে পাই যে অত্যাচারী মুসলমানগণ তাহাদেরই প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব।" জনৈক প্রিয়নাথ সেনও একইরকম লিখছেন, "আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বহু হিন্দু বাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক শিশুকে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। অনেক হিন্দুকে মুসলমান করা হইয়াছে এবং গরুর মাংস খাওয়ান হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করা হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের কুচকি থেকে তলপেট পর্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের স্তন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

বিভিন্ন চিঠি থেকে খুব নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করার কয়েকটি ঘটনা জানা যায়। ফণীভূষণ মজুমদার চিঠিতে লিখছেন, তাঁর কাকা অবনী মোহন মজুমদারকে তার বালকের সামনেই গলা কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব ছটফট করে ১৫ মিনিট পরে তিনি মারা যান। মুরারীমোহন শর্মা লিখছেন, আমার বাবাকে আমার সম্মুখে লাঠি ও গরু কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। গলা কেটে দেওয়া হয়। ১০-১৫ মিনিট খুব ছটফট করে মারা যান। গৌরাঙ্গচন্দ্র নাথ লিখছেন, তাঁর কাকা জগবন্ধুসহ গ্রামের ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শান্তিসভার আশ্বাস দিয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের প্রথমে লাঠি দিয়ে মেরে তারপর গলা কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাসের মতে, জনতা চেয়েছিল হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে- তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদের পূজিত মূর্তিকে অপবিত্র করে, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং তাদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে ('Communal Riots in Bengal 1905-47', পৃ-১৯৬)। অন্বেষা রায় তাঁর কেমব্রিজ থেকে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'Making

Peace, Making Riots: Communalism and Communal Violence, Bengal 1940-1947' –এ বলেছেন, ধর্মান্তরণ ছিল এই নোয়াখালি দাঙ্গার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য- যা অন্যান্য দাঙ্গা থেকে একে পৃথক করেছে। তাঁর মতে, জোর করে ধর্মান্তরণ ছিল পূর্বপরিকল্পিত, কোন স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। তিনি আরও লিখেছেন, দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত এবং লীগ নোয়াখালিকে পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনার গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল। রায়ের মতে, শ্রেণীগত স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা না গেলেও হিংসার ভয়াবহতা থেকে বোঝা যায় এর পিছনে মূল কারণ ছিল ধর্মীয়। অশোকা গুপ্ত লিখেছেন যে, ধর্মান্তরণের পর হিন্দুদের তাদের খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো বোনেদের বিয়ে করতে বাধ্য করা হত। শান্তনু সিংহের 'নোয়াখালি নোয়াখালি' অনুযায়ী, নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা কবলিত গ্রামগুলিতে এমন পরিবারের সংখ্যা খুব কমই ছিল, যে পরিবারের কোন না কোন মেয়ে অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়নি।

গণহত্যার পরঃ

বিভিন্ন সংগঠন নোয়াখালিতে ত্রাণকার্য চালায়। এর মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ত্রাণকার্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দুঃসাহসী অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের শান্তিরক্ষাকারী কমিটিগুলোকে বলা হত 'রক্ষী দল'। এরা যেসমস্ত হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। হিন্দু মহাসভাও নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার বহু জায়গায় ত্রাণ কেন্দ্র খোলে। ত্রাণকারী দল গ্রামে গ্রামে ঘুরলেও সেখানকার হিন্দুরা ভয়ে কিছু বলতে চাইছিল না। তাদের মুসলিমরা স্থানীয় ভাষায় ভয় দেখিয়েছিল, "কিছু কইবা তো কাইটা ফালাইমু" (রেণু চক্রবর্তী, 'Communists in Indian Women's Movement 1940-1950', পৃ-১০৫।)

নোয়াখালির গণহত্যায় বিচলিত হয়ে আইসিএস শৈবাল গুপ্তের স্ত্রী বিশিষ্ট সমাজসেবিকা অশোকা গুপ্ত কারও নির্দেশ বা অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে শিশু পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ান। ১৯৪৬-এর ২০-এ অক্টোবর তিনি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রিলিফের কাজ শুরু করেন। তাঁর 'নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে' গ্রন্থে (পৃ-৩৪) তিনি এক অল্পবয়স্ক দম্পতির মর্মন্তুদ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন- একজন মহিলাকে তিনি অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে লক্ষ্মীপুর থানায় নিয়ে আসেন অভিযোগ লেখাতে। মহিলাটি এল এবং লম্বা ঘোমটা টেনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মাঝে জানাল, অত্যাচার শেষ হয়ে যাবার দুই মাস পর পর্যন্তও প্রতি রাতে কয়েকজন মুসলমান তাকে ধরে নিয়ে যেত এবং 'ব্যবহার' করে সকালবেলা ফেরত দিয়ে যেত। থানার দারোগা তাদের নাম জানতে চাইলেন। তারা বলল নাম বলা মানে অবধারিত মৃত্যু।

মুসলিম বাড়িতে আটক থাকা বহু হিন্দু মেয়ে উদ্ধারে সুচেতা কৃপালিনী বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। অশোকা গুপ্তের বয়ান অনুযায়ী, সুচেতা নোয়াখালিতে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যে গোলাম সারওয়ার ঘোষণা করেছিল- যে সুচেতাকে ধর্ষণ করতে পারবে তাকে 'গাজী' উপাধি দেওয়া হবে। সুচেতা তাই নিজের গলায় একটি সায়ানাইডের ক্যাপসুল নিয়ে নোয়াখালিতে চলাফেরা করতেন ('নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে', পৃ-৬২-৬৩)। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনীর স্ত্রীরই যদি এই অবস্থা হয় নোয়াখালিতে- তাহলে বাকি হিন্দু মহিলারা কিভাবে জীবনযাপন করছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

নোয়াখালিতে গান্ধীজীঃ

নোয়াখালিতে গণহত্যার ভয়াবহতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নেলি সেনগুপ্ত প্রমুখ গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম মারফৎ জানান। গান্ধীজী নোয়াখালি গণহত্যা শুরু হওয়ার প্রায় ১ মাস পরে ১৯৪৬-এর ৭ই নভেম্বর নোয়াখালি পৌঁছন এবং ১৯৪৭ এর ২রা মার্চ নোয়াখালি ত্যাগ করেন। তাঁর এই চার মাসব্যাপী সফরের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর সফরসঙ্গী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর বই 'My Days with Gandhi' তে। এখানে আমরা পাই যে, "গান্ধী হিন্দুদের পরামর্শ দেন অহিংসার পথে থাকতে এবং আক্রান্ত হওয়ার সময় আক্রমণকারীকে আঘাত না করা, মৃত্যুভয়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার বদলে মৃত্যুকে বরণ করা এবং কখনই বাড়ি থেকে পালিয়ে না যাওয়ার। মহিলাদের পরামর্শ দেওয়া হয় নিজেদের সম্মানহানি হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করার জন্য এবং হিন্দুদের ভালবাসার উপদেশ তিনি দেন মুসলিমদের"। এটি বলেই নির্মলবাবু উপসংহার টেনেছেন, "তাঁর (গান্ধীজীর) এই পরামর্শের যাই প্রভাব হিন্দুদের ওপর হোক না কেন, সাধারণ মুসলিমদের কাছে তাঁর আবেদনের প্রায় কোন ফলই হয়নি।"

গান্ধীর নোয়াখালি সফরের এক সঙ্গী কমলা দাশগুপ্ত বলেছেন, গান্ধী যখন নোয়াখালির বিভিন্ন জায়গা হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন রাস্তার পাশে কিছু মুসলিম এবং খুব অল্পসংখ্যক হিন্দু দাঁড়িয়ে থাকত। বাপু মুসলিমদের সালাম ও হিন্দুদের নমস্কার করতেন। কিন্তু মুসলিমদের খুব কমজনই তার সেলামের উত্তর দিত। গান্ধী এখানে থাকার সময় মুসলিমদের বিভিন্ন হুমকি চিঠি পেতে থাকেন, যাতে তাঁকে বিহারে চলে যাবার কথা বলা হয়। নির্মল কুমার বসু-র লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, "ইতিমধ্যে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭) নোয়াখালিতে গান্ধীর অবস্থানের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিবাদ আরও জোরাল হয়, ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে তা কুৎসিত রূপ নেয়। তিনি যে রাস্তা দিয়ে যাবেন, তা প্রতিদিন নোংরা করে রাখা হত ইচ্ছা করে এবং তাঁর সভায় মুসলিমদের যোগদান দিন দিন কমতে থাকে"। কোন আশা নেই বুঝে গান্ধীজী ২রা মার্চ নোয়াখালি ত্যাগ করেন। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবিভাগকেও অনিবার্য করে তোলে নোয়াখালি।

এক দেশ-এক ভোট

বিরোধীদের এত আপত্তি কেন?

নারায়ণ চক্রবর্তী

এক দেশ- এক ভোট নীতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে সুইডেন। জাতীয় এবং প্রদেশ স্তরে এই পদ্ধতিতেই নির্বাচন হয় জার্মানিতে, একইসঙ্গে হয় লোকাল বডির নির্বাচন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একই পদ্ধতি। আমেরিকার পদ্ধতি হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সঙ্গেই তাদের পার্লামেন্ট ও রাজ্য গভর্ণর নির্বাচন করা। তাহলে শুধুমাত্র ভারতেই কেন বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমকে টুকে, জনগণের পয়সায় শ্রাদ্ধ করে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রবল ভরসা বিরোধী দলগুলির?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা "এক দেশ-এক ভোট" নীতি পাশ করতেই কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল "গেল, গেল" রব তুলে শোরগোল শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য খুব সহজ ব্যাখ্যা করলে বলতে হয়, ভারতীয় ভোট রাজনীতি এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে দেশের অখন্ডতার ও জাতীয়তাবাদের বিরোধীতাকে পর্যন্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নামে সমর্থন করা হয়। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের একটি করে ভোট সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই নির্বাচন "Winner takes all" তত্ত্বের ভিত্তিতে হয়। বিভিন্ন নির্বাচিত বডির জন্য পৃথক নির্বাচন - যা প্রতি বছরে দেশের কোথাও না কোথাও সংঘটিত হয়ে চলেছে। এর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কথা প্রথম বলি।

প্রতি বছর রাজ্য ভিত্তিক এবং স্থানীয় বডির নির্বাচনে বিস্তর খরচ। এতে সরকারের কোষাগারে অত্যন্ত চাপ পড়ে। দ্বিতীয় এবং বড় অসুবিধা হল নির্বাচনী বাধা নিষেধের আওতায় উন্নয়ণের কাজে বাধা। এতে সাধারণ চলমান প্রক্রিয়ায় বারবার উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। আবার এভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে যে সাংগঠনিক পরিকাঠামো দরকার এবং যে লোকবল দরকার, তা এই মূহুর্তে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নেই। এ কারনে কমিশনকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। তার জন্য সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। অবশ্যই এ কাজে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

তবে, সবচেয়ে বড় কথা হল, এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চালু করতে গেলে প্রথমে এই পদ্ধতিতে দেশের বেশিরভাগ রাজ্য সরকারের সম্মতি প্রয়োজন এবং তারপর একে বর্তমান পার্লামেন্টের অনুমোদন দিতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই পদ্ধতি চালু করার জন্য কিছু ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থান ধরলে তা তখনই সম্ভব, যখন সর্ববৃহৎ দুটি দল - বিজেপি এবং কংগ্রেস - এই পদ্ধতিকে সমর্থন দেবে। অন্যথায় এই পদ্ধতি implement করার ক্ষেত্রে ধোঁয়াশা রয়ে যায়।

এবার আসা যাক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে কারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এবং তাতে তাদের গণতান্ত্রিক কাঠামো কেমন চলছে। প্রথমে বলি সুইডেনের কথা। তারা এই পদ্ধতিকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের দেশের লোকাল বডির নির্বাচন পর্যন্ত পার্লামেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে হয়। ফলে, তাদের আলাদা করে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের নির্বাচন কমিশন থাকে না। আমাদের দেশে লোকাল বডি নির্বাচনের জন্য প্রতিটি রাজ্যে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন চালাতে হয়, তার বিপুল খরচ না হলে সেই অর্থ রাজ্যের উন্নয়ণে ব্যয় করা যেতে পারে।

তারপর ধরা যাক জার্মানির কথা। তারা অবশ্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় এবং প্রদেশ স্তরে একসঙ্গে নির্বাচন করে। শুধু লোকাল বডির নির্বাচন আলাদাভাবে হয়, যদিও সেই নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে একবারই হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একই পদ্ধতি। অবশ্য আমেরিকার পদ্ধতি হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সঙ্গেই তাদের পার্লামেন্ট ও রাজ্য গভর্ণর নির্বাচন করা। সেখানে যেহেতু রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে উল্টে দিতে পারে, সর্ব শক্তিমান রাষ্ট্রপতির হাতে দেশ চালানোর অধিকার থাকে এবং তার দেশ শাসনের পর্যায়ে দায়বদ্ধতাও রাষ্ট্রপতির উপর বর্তায়। ফলে, জনসাধারণের রায়ে যিনিই নির্বাচিত হন, জনসাধারনের কাছে তিনিই দায়বদ্ধ। এখানেই আমাদের দেশের সঙ্গে এদের তফাৎ। আমরা বৃটিশ ফর্ম অফ পার্লামেন্টারি সিস্টেমকে টুকে নিজেদের করে নিয়েছি। এখন বৃটিশ নাগরিকরা যেভাবে ভুগছে, আমাদেরও সেই ভোগান্তি

আসছে - তার পদধ্বনি ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে। কিভাবে? তাদের দেশের আদি নাগরিকদের সংখ্যানুপাতে কমিয়ে দিয়ে সেদেশের অভিবাসন নীতির সুযোগ নিয়ে যে অনুপ্রবেশকারীরা মানবিক কারনে দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে, তারাই এখন দেশের ভোটে সরকার গঠনের চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে, সে দেশের নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী তাদের কথা অনুযায়ী চলতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশটি ক্রমশঃ উন্নয়ণের নিরিখে পিছিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও অদূর ভবিষ্যতে একই অবস্থা হতে চলেছে।

এবার বলি, কেন বেশীরভাগ রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরোধীতা করছে। প্রথম কথাই হল, রাজ্যভিত্তিক দলগুলির প্রথমে রাজ্যস্তরে ক্ষমতা দখলের পর উদ্দেশ্য থাকে কেন্দ্রে কোন দূর্বল সরকার তৈরী হলে তারা সেখানে সরকারকে খুঁটি দিয়ে খাড়া করে রেখে সেই সরকারকে যতটা সম্ভব দোহন করে নিজেদের আখের গোছানো। অবশ্য এর রাজনৈতিক দায় থাকে সরকারের বিগ ব্রাদারের ঘাড়ে। এসব ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময়ই দেশের স্বার্থকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। সাম্প্রতিক বৃটেন তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ।

বর্তমান ভারতেও একই জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে দেশের জন্মের কারন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রাজনীতিকে হাতিয়ার করে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্যাক্তিগত আখের গোছানোর খেলা চলছে। কখনো গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদে রাষ্ট্র-স্বার্থ বিরোধীতাকে কোন দেশ মদত দেয় না। যে দেশ দেয় তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এভাবেই মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশ তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে, অনেক জাতি, সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়েছে। বৃটেনের মত সাংগঠনিক পরিকাঠামো রাখতে গিয়ে আমাদেরও সে অবস্থা হতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, অসম চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর থেকে অসমে কোন অহিন্দুকে NRCতে চিহ্নিত করতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেওয়ার পর, কম্যুনিস্ট দল সিপিএম এই রায়কে স্বাগত জানালেও কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরোধিতা করছে - তারা ভারতে অনুপ্রবেশকারী অহিন্দুদের দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে তাদের ভোটে দেশে ক্ষমতায় এসে, ভারত রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার মূলেই কুঠারাঘাত করতে চাইছে। আবার সম্প্রতি FBIএর একটি এক্তিয়ার বহির্ভূত বিজ্ঞপ্তিকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম দেশের প্রধানমন্ত্রীর জবাব চাইছে। এই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এক সময় পাকিস্তানের পক্ষে তাদের উপর ভারতের তথাকথিত আক্রমণের জন্য কৈফিয়ৎ চেয়েছিল! অথচ, চিন যখন ভারত সীমান্তে গোলমাল পাকায় তখন বর্তমান কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএমের দলবল ভারতকেই দোষারোপ করে। মোদ্দা কথা হল, ভারতের মুক্ত চিন্তার সুযোগ নিয়ে এরা যে কোন দেশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের আভ্যন্তরীন মিরজাফরগিরিকে তাদের রাজনৈতিক কৌশল বানিয়েছে।

পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশে এই ধরনের রাজনীতি বরদাস্ত করে না। ব্যতিক্রম বৃটিশ সংবিধান গ্রহণ করা দেশগুলি। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। এরা সকলেই এক দেশ এক নির্বাচনের বিরোধী! কেন? ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই বিরোধী জোটের দলগুলি, একমাত্র কংগ্রেস ছাড়া, সে অর্থে কোন সর্বভারতীয় দলই নয়। সিপিএম যে রাজ্যে জোট সরকারের প্রধান দল, তারা গত লোকসভা নির্বাচনে সে রাজ্য, কেরলে একটি আসন পেয়েছে! তারা আরেকটি রাজ্য ভিত্তিক দল ডিএমকের লেজুড় হয়ে তামিলনাড়ুতে দুটি আসন এবং কংগ্রেসের আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে রাজস্থানে একটি আসন পেয়েছে। তৃণমূল, যারা প্রতি লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচার করে তাদের নেত্রী এবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, সেই দিবাস্বপ্ন দেখা দলটি অনেক রাজ্যে নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার পর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকার কারনে ২৯ টি আসন পেয়েছে এই রাজ্য থেকে।

ভবিষ্যতের আকাশকুসুম কল্পনা দেখিয়ে জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে ভোট যুদ্ধে জিততে চায়। কিন্তু এক দেশ, এক নির্বাচন নীতিতে যে যেখানে শাসক, তার পজিটিভ দিকগুলোর সঙ্গে অন্যদের তুলনা চলে আসবে। ফলে, এক তরফা ভুল প্রচারের স্ট্র্যাটেজি খুব একটা কাজে আসবে না। আবার এই ছোট দলগুলির সঙ্গতি অপর্যাপ্ত হওয়ার কারনে তারা একসঙ্গে বেশী আসনে নির্বাচন কভার করতে অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু এসব অসুবিধা বিজেপি এবং কংগ্রেসের মত সর্বভারতীয় দলের নেই। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের এই নীতির বিরোধীতা করার কারন কি? ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বর্তমান কংগ্রেস দলের নামটা ছাড়া বাদবাকি সব কিছুই এক বিশেষ পরিবারের কাছে গচ্ছিত। এই দলের রাজনৈতিক সাফল্য এমন যে, সাম্প্রতিক অতীতে এরা যে যে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে, সে সব রাজ্যে একটা টার্মের পরের বার তারা ক্ষমতা থেকে সরে গেছে। অর্থাৎ তাদের সরকারের গ্রহণযোগ্যতা কাজের বিচারে কখনো স্থায়ীত্ব পাচ্ছে না। আবার, দেশের বাইরের বিভিন্ন শক্তি, যারা ভারতের স্থায়ীত্ব নষ্ট করার খেলায় নেমেছে, তাদের সঙ্গে বারবার এই কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের যোগাযোগের খবর সংবাদে এসেছে। সুতরাং, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক সুস্থিরতাকে যারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করছে, সে সব দেশ ভারতের জাতীয়তাবোধের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে সুবিধাবাদী জোটকে মদত দিয়ে দেশের প্রগতি ও উন্নয়ণের মাঝে বাধা তৈরী করতে চাইছে। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী সব রাজনৈতিক দলকেই দায়িত্ব নিয়ে এই বিদেশী মদতপুষ্ট চক্রান্তকে ব্যর্থ করার প্রয়াস চালাতে হবে।

ইজরায়েলি সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্যালেস্টাইন ইস্যুর প্রাসঙ্গিকতা

ভারতীয় প্রেক্ষাপট

অধ্যাপক আবীর রায়গাঙ্গুলী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারত সবসময় প্যালেস্টাইনের পক্ষে ভোট দিলেও, ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশনের মূল কারণই ছিল কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে এবং জেরুজালেম প্রশ্নে ইজরাইলের বিরোধীতা করা। তবে, নতুন ভারত বৈদেশিক নীতির মূল মন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে জাতীয় স্বার্থকে। ভারতের জাতীয় স্বার্থেই গুরুত্ব হারিয়েছে প্যালেস্টাইন ইস্যু।

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্যালেস্তাইন চিরকালই একটি জায়গা করে রেখেছিল। ভারতের বিপুল সংখ্যক মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে ভারতের আমেরিকা বিরোধিতা ইত্যাদির কারণে ১৯৪৭ থেকেই ভারত ইজরায়েল -প্যালেস্তাইন বিরোধে বিভাজনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মতদান করে। অর্থাৎ তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজের দেশে বিভাজন অনস্বীকার্য হিসেবে মেনে নিলেও, প্যালেস্টাইন ভেঙে ইসরায়েল তৈরি করাকে তাঁরা মেনে নিতে পারিনি। নানাবিধ টালবাহানার পর, ১৯৫০ সালে ব্রিটেনের ইসরাইল কে স্বীকৃতি দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন দিল্লি স্বীকৃতি দেয় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে। এরপর থেকে বিভিন্ন ইজরায়েল – আরব যুদ্ধে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তির পক্ষে দাঁড়ালেও, ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি এটাকে একটা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করেছিল। ইসরায়েলের সীমান্তে বোমা পড়লেও কলকাতার রেড রোডে বা দিল্লির যন্তর মন্তর – এ মিছিল, মিটিং প্রতিবাদ, ধর্না হতো। তবে, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধের একবছরে ভারতের মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলো বা সুশীল সমাজ এই নিয়ে কোনপ্রকার ইসরাইল বিরোধী ধর্ণা, প্রতিবাদ করেনি। বিক্ষিপ্ত মুসলিম সংগঠন কিছু এই নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, বামপন্থী কিছু ছাত্র সংগঠন কলেজ-ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এই নিয়ে সীমিত থেকেছে। কিন্তু, রাজনীতি র মূলস্রোতে এর জায়গা হয়নি। এমনকি প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেস ও এই বিষয়ে খুব সোচ্চার হয়নি, শুধুমাত্র প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাঁর আসন্ন লোকসভা বাই ইলেকশনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওয়েনাডে ভোটের প্রচারে গিয়ে এই ইস্যুটি তুলেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, ভারতে কেন প্যালেস্টাইন ইস্যু আর আগের মতো একটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যু নেই?

৭ই অক্টোবর, ২০২৩-এ মাটিতে যে নৃশংস আক্রমণ হামাস জঙ্গিরা চালিয়েছিল, তা ইহুদি জাতির ইতিহাসে'হলোকস্ট'-র পরে এই প্রথম। এর প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েল গত এক বছরে হামাসের শীর্ষ নেতাদের প্রায় সকলকেই নিকেশ করেছে এবং গাজায় হামাসের বিভিন্ন গোপন ঘাঁটিসহ বিভিন্ন স্থানে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, যেখানে প্রাণহানি হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের পাশে দাঁড়িয়েছে শিয়া জঙ্গি সংগঠন হিজবুল্লাহ। মনে রাখতে হবে, এই হিজবুল্লাহ মূলত ইরানের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি জঙ্গি সংগঠন, যারা লেবাননে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। ৭ই অক্টোবরের পর থেকেই ইজরায়েলের উত্তর সীমান্তে লেবানন থেকে হিজবুল্লাহ ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীতে ইয়েমেনের হাউথি জঙ্গিরাও এই আক্রমণে যোগ দেয়। এই কৌশল এর আগেও বহুবার আরব দেশগুলো ব্যবহার করেছে। তবে অতীতে, ১৯৪৮ বা ১৯৭৩—প্রতিবারই আরব দেশগুলো ইজরায়েলকে বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধের (Multiple-front Warfare) সম্মুখীন করার চেষ্টা করেছে, যদিও তাতে যুদ্ধের পরিণামে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে, গত এক বছরে হামাসের সাথে আরব দেশগুলির সরাসরি কোনো সামরিক জোটবদ্ধতার ঘটনা ঘটেনি। এই যুদ্ধ এখন মূলত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইসলামিস্ট জঙ্গি সংগঠনগুলোর । যদিও বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রগুলো প্যালেস্টাইন সমস্যার দ্রুত সমাধান চেয়েছে, উদ্বাস্তু সমস্যার দ্রুত সমাধান চেয়েছে, অনেকে 'দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান' বা two-state solution -র পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন, তারা ইজরায়েলের 'কড়া সমালোচনা' ছাড়া কিছুই করেনি। অতীতে যারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে এখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমালোচনাই রয়ে গেছে। গত এক বছরে হামাসের আক্রমণের পর পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশগুলো খুবই সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই সময়ে হামাস সরাসরি সাহায্য পেয়েছে শুধুমাত্র লেবানন ও ইরানের কাছ থেকে।

পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্টাইন সমস্যার এহেন প্রান্তিকীকরন

আরব দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন নির্দেশ করে। ১৯৯০'র সময় থেকে যখন সাদ্দাম হুসেনের ইরাক কুয়েত দখল করে, তখন সমগ্র আরব দুনিয়ায় সাদ্দামের এই কাজকে একমাত্র সমর্থন জানান ইয়াসের আরাফাত, যে আরাফাত নিজের উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন কুয়েতেই। ফলস্বরূপ, প্যালেস্টিনিয় অনুপ্রবেশেকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো কুয়েতে। বহু আরব দেশ প্যালেস্তাইন সমস্যাকে লঘু করে দেখতে শুরু করলো, যদিও এর অনেক আগে জর্ডন প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তুদের উৎখাত করেছিল, কারণ তারা জর্ডনে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। জর্ডন রাজার এই অপারেশনকে বলবৎ করেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানী সেনা জেনারেল জিয়াউল হক।

দ্বিতীয়তঃ, ২০০৯ থেকে শুরু হওয়ায় 'আরব বসন্ত' (Arab Spring) যা তথাকথিত ও আপাতভাবে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ছিল পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায়, তার নিয়ন্ত্রণ কম সময়ের মধ্যেই ইসলামিষ্ট জঙ্গী সংগঠন গুলির হাতে চলে যায়। ফলতঃ, এই বিস্তর্ণ অঞ্চলে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিজেদের টিকে থাকাটাই অগ্রাধিকার পেতে থাকে এবং প্যালেস্তাইন ইস্যু গুরুত্ব হারায়। উল্টে বিভিন্ন প্যালেস্তিনীয় জঙ্গী সংগঠনগুলি, যেমন হামাস, এটি অঞ্চলের অন্যান্য জঙ্গী সংগঠন গুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, যারা নিজ নিজ স্থানে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল। কাজেই 'শত্রুর মিত্র শত্রু' এই তত্ত্বে ইজিপ্ট, ইয়েমেন, জর্ডন ইত্যাদি আরবদেশ প্যালেস্তিনীয়দের থেকে দূরত্ব তৈরী করে।

তৃতীয়তঃ, সৌদি আরব, আমিরশাহীর মতো দেশগুলি সাম্প্রতিক অতীতে বারবার মৌলবাদের সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে। এগুলি যে তাদের পক্ষেও অস্তিত্ব সংকট, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। একই সঙ্গে তারা জানে যে তেল তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা চিরস্থায়ীভাবে সমাধান করতে পারবে না। তাই তারা একটি বাজারমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যা পশ্চিমা বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, আমেরিকার দীর্ঘকালীন সহযোগী, সুন্নী বিশ্বের নেতা সৌদি আরব ও তার সহযোগী দেশগুলি যেমন বাহরিন, আমিরশাহী ইত্যাদি ইসরাইলের প্রশ্নে সুর নরম করে কারণ ইসরাইল শুধু আমেরিকার বন্ধুই নয়; ইজরাইল প্রযুক্তি থেকে স্টার্ট-আপ, নিরাপত্তা থেকে বাণিজ্য সবেতেই সম্ভাব্য অংশীদার হওয়ার উপযুক্ত।

অপরদিকে পশ্চিম এশিয়ার আরবী প্রভুত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো শিয়া দুনিয়ার একচ্ছত্র নেতা ইরান, যে স-ঘোষিতভাবে আমেরিকা ও ইজরাইলের শত্রু, এব্য. আরব দুনিয়ায় আমির/শেখ/সুলতান দের অস্তিত্বকে অ-ইসলামী বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ইরান পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টাতে চায় এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। সেই উদ্দেশ্যেই ইরান পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনকে মদত দিয়ে চলেছে, যাতে তাদের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করা যায়। ইরানকে আটকাতে হলে ইসরাইলের সাথে মিত্রতা কার্য্যকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই কারণেই আমিরশাহী, বাইরিন সহ চারটি দেশ ২০২১ সালে ইজরাইলের সাথে সাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আরব দেশগুলির জন্য একটি কার্যকরী কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, ভারতও ১৯৯০-এর দশক থেকে পশ্চিম এশিয়া নীতিতে পরিবর্তন এনেছে। ১৯৯২ সালে ভারত ইজরায়েলের সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে, যদিও ১৯৫০ সালে ভারত ইজরায়েলকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। ইজরায়েল ভারতের জন্য অস্ত্র সরবরাহকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হয়ে উঠেছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এসব যুদ্ধেই ইজরায়েল যুদ্ধের অভিমুখ বদলে দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধে ইসরায়েলি ড্রোন থেকে পাওয়া এরিয়াল পিকচার ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায়ও ইজরায়েল ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে কাজ করছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষায় যে ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার হয়, তার একটি বড় কৃতিত্ব ইজরায়েলকে দিতেই হবে। মিসাইল প্রযুক্তিতেও ইজরাইলি অবদান অনস্বীকার্য। এমনকী, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে (২০১৯) যে স্পাইস ২০০০ স্মার্ট বম্ব ব্যবহার হয়েছিল, তার স্মার্টকিট টি ইজরায়েলি ছিল। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে ইজরাইল ভারতের ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মিত্র রাষ্ট্র, যতটা আমেরিকা, ফ্রান্স বা রাশিয়া। অপরদিকে, হামাসের ইজরায়েল আক্রমণ প্রবলভাবে ক্ষতি করেছে ভারতের প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক সংযোগকে যা ভারতীয় পন্য কে দুবাই, সৌদি আরব, ইসরায়েলের হাইফা বন্দর হয়ে সাইপ্রাস অথবা গ্রীস মারফত পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল ইউরোপের বাজারে। সভাবতই, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ত ইরান, তুর্কী এবং অবশ্যই চীন ও তাদের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' উদ্যোগ।

অপরদিকে, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেসন অথবা আরব বিশ্বকে ভারত কখনই পাশে পায়নি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে বা কাশ্মীর প্রশ্নে। তারা ভারতকে পাকিস্তানের সাথে আলাপ আলোচনার উপদেশ দেয় অথচ ইজরাইল বিরোধিতায় তারা কোন আলোচনার পরিসর রাখতে রাজি নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারত সবসময় প্যালেস্টাইন-র পক্ষে ভোট দিলেও, ১৯৬৯ সালে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হলো--অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন যা প্রতিষ্ঠার মূল কারণই ছিল কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে এবং জেরুজালেম প্রশ্নে ইজরাইল কে বিরোধীতা করা। তবে, নতুন ভারত বৈদেশিক নীতির মূল মন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে জাতীয় স্বার্থকে। কাজেই ভারতের জনগণের মধ্যে তথা রাজনৈতিক পরিসরে প্যালেস্টাইন ইস্যু গুরুত্ব হারিয়েছে কারণ বিচারের মাপকাঠি আর রিলিজিয়ন নয়---মাপকাঠি জাতীয় স্বার্থ।

ফেক নিউজ

ভারত বিরোধিতায় হাতে হাত তৃণমূল কংগ্রেস ও কানাডা সরকার

জাস্টিন ট্রুডো, কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা তাঁর দলের নেই। তাই ভারত বিরোধী এবং খালিস্থানপন্থী জগমিত সিংয়ের নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থন নিয়ে শেষ চার বছর সরকার চালাচ্ছিল জাস্টিন ট্রুডো। কিন্তু আগামী

নির্বাচনে জাস্টিন ট্রুডোর হার সুনিশ্চিত বুঝে গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় জগমিত সিং। এ অবস্থায় ক্ষমতার ক্ষুদ্র স্বার্থে এবং নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থন পুনরায় ফিরে পেতে যুক্তিহীনভাবে তীব্রতর ভারত বিরোধীতার রাস্তা

নেয় জাস্টিন ট্রুডো। বলে রাখা ভালো ভারত বিরোধী খালিস্থানি জঙ্গি হত্যা মামলায় ভারতীয় আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ তো দূরের কথা নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতেই পারেনি কানাডা সরকার। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো নিজে জানিয়েছেন সবটাই তার অনুমান - আপাতত তিনি নিশ্চিত নন। উল্টোদিকে শৌর্যচক্র পাওয়া ভারতীয় বীর বলভিন্দর সিং সাধুর হত্যা মামলায় কানাডার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে কর্মরত সন্দীপ সিং সিধুর কথা ভারত সরকার প্রমাণ ও নাম সহকারে জানিয়েছে কিছুদিন আগেই। অর্থাৎ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট রাষ্ট্র ভারতকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে কানাডা সরকার মিথ্যাচার করছে। রাজনীতির ক্ষুদ্র স্বার্থে ভারত বিরোধী মিথ্যে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কানাডা সরকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিদেশ নীতি সংক্রান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ও কানাডা সরকারের মিথ্যাচারের সমর্থনকারী হিসেবে এগিয়ে এসেছেন ভারতের দুই সাংসদ। সংসদীয় রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রবাদের ন্যূনতম আদর্শ ভুলে গিয়ে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে মিথ্যাচারে সামিল হয়েছেন তাঁরা। বাংলা ও বাঙালির জন্য লজ্জাজনক বিষয় হলো উক্ত দুই সাংসদই পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। অকারণে বিজেপি বিরোধীতা করতে গিয়ে তাঁরা এতটাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন যে এখন তাঁরা ঘুরিয়ে ফেক নিউজ ছড়ানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধীতার পথে হেঁটে চলেছেন।

মোদী বিরোধিতায় গান্ধীর অপমানেও পিছপা নয় বাম-তৃণমূল-কংগ্রেস

রাজনীতির জন্য দেশের ভালো মন্দের কথা বাম কংগ্রেস ভাবে না। আর তাই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে শুরু হওয়া তাঁরই আদর্শে চলা স্বচ্ছ ভারত মিশন নিয়েও ফেক নিউজ ছড়ানোর মাধ্যমে বদনাম করতে পিছপা হচ্ছে না কংগ্রেস। কিছুদিন আগে একটা ছবি পোস্ট করে কংগ্রেস দাবি করে নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প স্বচ্ছ ভারত মিশন আসলে ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস এবং তাদের দোসর তৃণমূল - বামেরা সাথে সাথে সেই ছবিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়।

বলা হয় সেই ছবি নাকি নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটের। পরে জানা যায় আবর্জনাময় সেই জায়গা কলকাতা পৌরসভার এক বিশেষ অঞ্চলের যেখানে সরকারি নিয়মকানুন পুরোটা খাটে না। এই জঞ্জাল এবং আবর্জনা পরিষ্কারের দায় ১০০% পৌরসভার। এবং তারা তাতে ব্যর্থ। তাই মিথ্যে খবর ছড়ানোর মাধ্যমে তৃণমূলের জোটসঙ্গী কংগ্রেস চেষ্টা করছে তাদের দোষ কিছুটা লঘু করার।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ফেক নিউজ

তৃণমূল যেখানে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর ছড়াতে উঠে পড়ে লেগেছে সেখানে তাদের তোষণ করে চলা একটি

বর্তমান

‘আবার ৫০ শতাংশ দাম বাড়ল ওষুধের, জাস্টিস চাইবেন তো?’

আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাছে জানতে চান আম জনতা

সংবাদপত্র যে পিছিয়ে থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। একটি খবরে দাবী করা হয় অনেক জীবনদায়ী ওষুধের দাম নাকি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোন ওষুধের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তা যেমন বলা হয়নি। তেমন কবে বৃদ্ধি হয়েছে সেটাও জানানো হয়নি। ঘটনা হলো নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর বিভিন্ন জায়গায় প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি নামক প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক কম মূল্যে ওষুধ বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। যথারীতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্পকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে সব রকম প্রচেষ্টা আজও চালিয়ে যাচ্ছে। আবার ওষুধের ব্র্যান্ড নেম না লিখে শুধুমাত্র জেনেরিক নাম লেখার যে প্রস্তাব কেন্দ্র দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটাও মানেনি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় আজও ওষুধের কালোবাজারি যথেষ্ট পরিমাণে হয়। তাই অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি দামে ওষুধ কিনতে বাধ্য হন বঙ্গবাসী। এর মানে কোনদিনই এটা নয় যে ভারত সরকার ওষুধের দাম বাড়িয়েছে। বরং উল্টোটা সত্যি। খুব সম্প্রতি বেশ কিছু জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধা করেছে মোদী সরকার। এখন তৃণমূল কংগ্রেস সেসব সুবিধা বঙ্গবাসীকে নিতে না দেওয়ার দায় কিভাবে কেন্দ্রের উপর যায় তা উক্ত সংবাদপত্র ছাড়া বোধহয় আর কেউ জানে না।

আনন্দের বাজারে মিথ্যা খবর

জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলে আর এক অর্থ সত্য খবর। এমন ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে শিয়ালদা ডিভিশন নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনও ট্রেন ৩০ সেকেন্ডের বেশি একটা স্টেশনে দাঁড়াবে না। এতে বহু মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ব্যস্ত অনেক স্টেশনে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনা হলো কোন স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানোর এই সময়সীমা স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী আমল থেকে চলে আসছে। কিন্তু এর মানে কোনদিনই এটা নয় যাত্রী ওঠা নামা করছে এই অবস্থায় ট্রেন ছেড়ে দেবে। যাত্রী ওঠা নামা শেষ হলে রেল কর্মী সিগন্যাল

দেন এবং তারপর ট্রেন ছাড়ে, এটাই নিয়ম। যাত্রী উঠানামা না হলেও একটা ন্যূনতম সময় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলেছিলেন শিয়ালদা ডিভিশনের এক আধিকারিক। সাথে অবাঞ্ছিত দেরি না করার কথা বলেছিলেন তিনি। আর সেটাকেই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অর্ধসত্যের আকারে এমন ভাবে পরিবেশন করা হলো যাতে ভুল বুঝতে বাধ্য হন ওই খবরের পাঠকেরা। বলার অপেক্ষা রাখে না রেল যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে তাই অযৌক্তিক বদনামের ভাগীদার বিজেপিকেই হতে হল।

তৃণমূলের মাসতুতো ভাই রোহিঙ্গা

কিছুদিন আগেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন রাজ্যে কোন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী নেই। উল্টোদিকে বিজেপি বারবার দাবি করে আসছে ভোট ব্যাংকের ক্ষুদ্র স্বার্থে রাষ্ট্র সুরক্ষার জন্য বিপদজনক রোহিঙ্গাদের ব্যাপক মাত্রায় আশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। তাই তৃণমূলের দাবি যে মিথ্যে এবং বিজেপি যে সত্যি বলছে সেটা প্রমাণ করে সাথে থাকা ছবি। বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ট্রাকে করে মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যায় ট্রাকটি। জানা যায় তৃণমূল যে শুধু রাজ্যেই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছে এমনটা নয় বরং সারা দেশে তাদের ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হচ্ছে।

৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

দাদা সাহেব ফালকে সম্মানে সম্মানিত

মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

/BJP4Bengal bjpbengal.org

নতুন দিল্লিতে মহা বিজয়া দশমী অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

মহা বিজয়া দশমীতে দার্জিলিংয়ের সুকনা ক্যান্টনমেন্টে জওয়ানদের সঙ্গে শস্ত্র পূজনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

লাওসে রয়্যাল থিয়েটার অফ লুয়াং প্রাবাং অভিনীত রামায়ণের স্থানীয় সংস্করণ 'ফ্রা লাক ফ্রা রাম' শিল্পীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

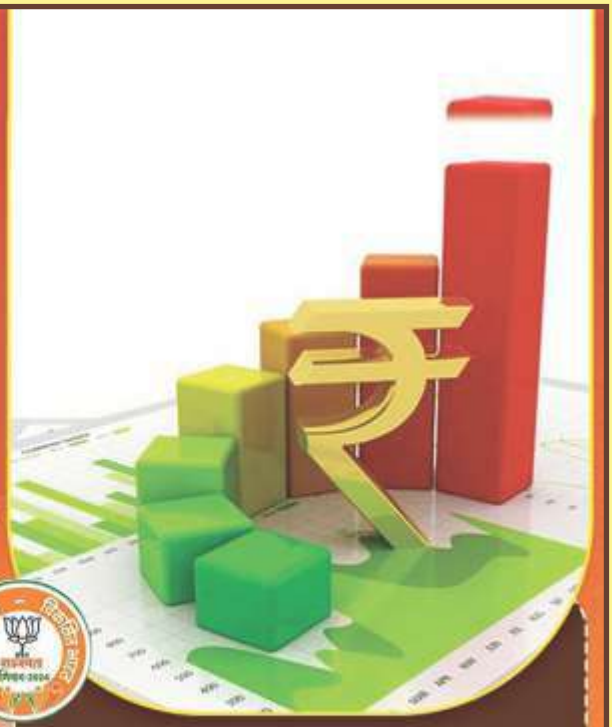

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।